ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

স্বাধীন বাংলাদেশ: একটি ঐতিহাসিক অতিক্রমণ

*মঈন উদ্দীন আহমেদ

সার-সংক্ষেপ: সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বাংলাদেশ। এই দেশ বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এক বৃহৎ অঞ্চলের খণ্ডিত রূপ। প্রাচীন 'বাঙ্গালা' কিংবা 'বঙ্গদেশ' নামক অঞ্চলটি রাঢ়, গৌড়, পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। বর্তমান বাংলাদেশ এসব জনপদের কয়েকটির সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশ গঠনের পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। এই দেশ বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় ও বিদেশী শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে, শোষিত হয়েছে। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে এদেশের মানুষের যেমন রয়েছে সুখকর উপলব্ধি, তেমনি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। প্রাগৈতিহাসিক কাল, মৌর্য, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ, পাল ও সেন রাজবংশ, মুসলিম, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসন– অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ। এই রচনা বাংলাদেশের সুপরিসর ইতিহাসের সংক্ষেপ রূপায়ণ মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেতে আগ্রহী পাঠকগণ এর থেকে উপকৃত হবেন– এমনই প্রত্যাশা।]

প্রাচীন জনপদসমূহ

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর পরিভ্রমণের সময় (৬৩৮ খ্রি.) পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ), সমতট (পূর্ববঙ্গ), তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ) এবং কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ)– এই চারটি রাজ্যের উল্লেখ করেছেন। সেসময় রাজাগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্যগুলো শাসন করতেন। এসব রাজ্যের সঠিক সীমানা, বিস্তৃতি নির্ণয় করা কঠিন। কেননা বিভিন্ন সময় 'ভৌগোলিক পরিমণ্ডল প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার বা হ্রাসও এদের পরিমণ্ডল পরিবর্তন করেছে।'[১] সংক্ষেপে জনপদগুলোর পরিচয় দেয়া হলো।

রাঢ়: খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈনগ্রন্থ আচারঙ্গসূত্রে প্রথম রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। জনপদটি সুহ্মভূমি ও বজ্রভূমি এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উভয় অংশের মাঝখানে প্রবাহিত ছিল অজয়নদ। বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর অধিকাংশ, মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্তি ও হাওড়া অঞ্চল নিয়ে সুহ্মভূমি। পরে এটি দক্ষিণরাঢ় বলে পরিচিতি পায়। অন্যদিকে অজয়নদের উত্তর দিকের ভূ-ভাগ নিয়ে বজ্রভূমি বা উত্তররাঢ়। এর মধ্যে রয়েছে বীরভূম, বর্ধমানের উত্তরাংশ ও হুগলীর কিছু অংশ। মুর্শিদাবাদের কান্ডিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুমান করা হয়– দিনাজপুরের বর্তমান বাণগ্রামই ছিল প্রাচীন রাঢ়ের রাজধানী– কোটিবর্ষ।

গৌড়: প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক পাণিনির (পঞ্চম খ্রি.পূ.) 'অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ'-এ গৌড়ের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' গ্রন্থেও গৌড়ের প্রসঙ্গ এসেছে। 'ভবিষ্য পুরাণ'-এ বর্ধমানের উত্তরে, পদ্মার দক্ষিণে গৌড়ের স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। রাজা শশাঙ্ক ৬০৬ সালে গুপ্তবংশীয় শাসকের নিকট থেকে গৌড় মুক্ত করে কর্ণসুবর্ণ নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে এখানে অনেক রাজারই রাজধানী ছিল। মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের কিছু অংশ নিয়ে ছিল এই জনপদের অবস্থান।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র: পুণ্ড্র একটি জাতির নাম। বৈদিক গ্রন্থে এই জাতির উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগের শিলালিপি ও চীনা পরিব্রাজকদের লেখা থেকে অনুমান করা হয়– পুণ্ড্র জাতির বাসস্থান ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। পরবর্তী সময়ে জনপদটির রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় পুণ্ড্রবর্ধনপুর বা পুণ্ড্রনগর। বগুড়ার অদূরে অবস্থিত মহাস্থানগড়ই প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। 'বায়ু, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, অপুত্রক বলিরাজা পুত্রার্থে বৃদ্ধ আর্যঋষি দীর্ঘতমাকে নিয়োগ করেন এবং দীর্ঘতমার ঔরসে ও বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে বলিরাজার যে পাঁচটি পুত্র হয় তাঁদের নাম ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এবং তাঁদের নামে পাঁচটি জনপদ প্রতিষ্ঠিত হয়।'[২] অঙ্গ বর্তমান ভাগলপুর। কলিঙ্গ উড়িষ্যা ও তার দক্ষিণাঞ্চল। পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গের অবস্থান যথাক্রমে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে। কর্ণ, কৃষ্ণ, ভীম পুণ্ড্ররাজ্য অধিকার করেছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে চুনাপাথরের উপর ব্রাহ্মীলিপিতে প্রাকৃত ভাষায় খোদিত মৌর্যসম্রাট অশোকের আমলের (২৭৩-২৩২ খ্রি.পূ.) একটি শিলাখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকেও পুণ্ড্রনগরের অবস্থান মহাস্থানগড় এলাকায় বলে অনুমান করা হয়। গঙ্গা থেকে শুরু করে করতোয়া পর্যন্ত এক বিশাল অঞ্চল নিয়ে পুণ্ড্রবর্ধনের অবস্থান ছিল।

বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধন জনপদভুক্ত অঞ্চল। সন্ধিকৃত শব্দ বর+ইন্দ্র বরেন্দ্র– অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের বর বা আশীর্বাদপ্রাপ্ত দেশ। যদিও পৌরাণিক যুগে বরেন্দ্র নামের কোনো উল্লেখ নেই। নেই মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি যুগেও। বরেন্দ্র নামক জনপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়– দশম শতাব্দীর বরেন্দ্র অঞ্চলের অধিবাসী পালরাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম' নামক কাব্য গ্রন্থে। সেখানে কবি প্রশস্তিতে আছে–

'বসুধা শিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণিঃ কুল স্থানম।
শ্রী পৌণ্ড্রবর্ধনপুর-প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভব্বৃহদ্ঘটু ॥

অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধনপুরের নিকটবর্তী বৃহদ্ঘটু নামক পুণ্যভূমিতে কবির নিবাস, এ স্থান ধরণির শ্রেষ্ঠ (শির) বরেন্দ্র মণ্ডলের চূড়ামণি।'[৩] ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ৯৬৭ সালের একটি দক্ষিণী লিপিতে বরেন্দ্রদ্যুতিকারিণ ও গৌড়চূড়ামণি নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ থাকার কথা বলেছেন। বরেন্দ্র ও পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলের অবস্থান প্রায় অভিন্ন। বরেন্দ্র প্রাচীনকালে পুণ্ড্র নামেই পরিচিত ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী গঙ্গা আর করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূ-খণ্ডকে বরেন্দ্রী বলেছেন। প্রাচীন সাহিত্য ও শিলালিপি থেকে পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন– বর্তমান দিনাজপুর, রংপুরের কিছু অংশ, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা এলাকা এই বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ছিল।

বঙ্গ: 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গ নামটি দেখা যায়। বৌধায়নের 'ধর্মশাস্ত্র'-তে বঙ্গের উল্লেখ আছে। রামায়ণ-মহাভারতেও নামটি উপস্থিত। এই প্রাচীন জনপদটি বর্তমানের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। কোনো এক সময় বঙ্গের এই সীমারেখা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পূর্ব তীর এবং পশ্চিমে কপিশানদী পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাল ও সেন রাজাদের আমলে এই আয়তন সংকুচিত হয়ে পড়ে। এসময় গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই জনপদটি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিভক্ত হয় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ বা অনুত্তরবঙ্গ নামে

দুটি অংশে। উত্তরবঙ্গের উত্তরসীমা ছিল পদ্মানদী, আর দক্ষিণের ব-দ্বীপ অঞ্চলগুলো নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ।

সমতট: ষষ্ঠ শতাব্দীর পুঁথি 'বৃহৎ সংহিতা'য় সমতট নামের উল্লেখ আছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভে এই জনপদের নাম খোদিত রয়েছে। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ মতে– অঞ্চলটির অবস্থান ছিল কামরূপের দক্ষিণে আর্দ্র ও নিম্নাঞ্চলে। ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী ভূ-খণ্ড নিয়ে এই জনপদটির অবস্থান। ত্রিপুরার কামতা ছিল এই জনপদের রাজধানী।

হরিকেল: হরিকেলের অবস্থান ছিল পূর্বভারতের প্রান্তসীমায়। চন্দ্র রাজবংশের বিবরণ থেকে জানা যায়– হরিকেলরাজের প্রধান সহায়ক ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র। সেসময় সমতট ও হরিকেলকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হতো। হেমচন্দ্র তাঁর 'অভিধান চিন্তামণি' গ্রন্থে বঙ্গ ও হরিকেলকে একার্থবোধক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থ 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে সমতট, হরিকেল ও বঙ্গ পৃথকভাবে উল্লেখ আছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত দুটি পুঁথিতে হরিকেলকে সিলেটের প্রাচীন নাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো পুঁথিতে দেখা যায়– এক সময় হরিকেল বর্তমান সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাপানে মুদ্রিত একটি মানচিত্রে তাম্রলিপ্তির দক্ষিণে হরিকেলের অবস্থান দেখান হয়েছে। আলোচিত জনপদগুলোর সঙ্গে চন্দ্রদ্বীপ ও তাম্রলিপ্তির প্রসঙ্গও এসে পড়ে। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শাসনাধীন চন্দ্রদ্বীপের অবস্থান ছিল বর্তমান বরিশাল জেলায়। আর প্রাচীন বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর হিসেবে খ্যাত তাম্রলিপ্তির অবস্থান ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক অঞ্চলে।

প্রাগৈতিহাসিক কালের বাংলাদেশ

পুরাণ ও মহাভারতে বলি নামক জনৈক রাজার পাঁচজন পুত্রের নামানুসারে যে পাঁচটি জনপদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল– সে বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। দ্রৌপদীর সয়ম্বর সভায় ভারতের অন্যান্য রাজার সঙ্গে বঙ্গরাজ চন্দ্রসেন, পুণ্ড্ররাজ পৌণ্ড্রিক বাসুদেব ও তাম্রলিপ্তির রাজার উল্লেখ আছে। মহাভারতে কর্ণের অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ অভিযানের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ ও ভীম পুণ্ড্ররাজ্য অধিকার করেছিলেন। পৌণ্ড্রিক বাসুদেব পুণ্ড্র, বঙ্গ ও কিরাতরাজ্য একরাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এসমস্ত তথ্য থেকে মনে করা হয়– মহাভারতের যুগে বাংলা অনেকগুলো খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এসবের রাজনৈতিক যোগসূত্র ছিল। রাজাগণের শৌর্য-বীর্য ও সামরিক প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে বাংলার বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দিগ্বিজয়ী গ্রিকবীর আলেকজান্ডার ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সেসময় বাংলায় গঙ্গারিডই (Gangaridi) কিংবা গন্ডারিডই (Gandaridi) নামক পরাক্রমশালী একটি জাতি বিদ্যমান ছিল বলে গ্রিক লেখকগণ উল্লেখ করেছেন। এই জাতির অপ্রতিহত রাজশক্তি সম্পর্কে ডিওডোরাস (Diodorus) এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন যে– 'ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গারিডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের চারি সহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত

রণহস্তী আছে, এইজন্যই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজান্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন।'[৪] তবে এই রাজ্যের অবস্থিতি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ গঙ্গানদীকে এর পূর্ব সীমা, আবার কেউ পশ্চিম সীমা বলে মত দিয়েছেন। রোমান পণ্ডিত প্লিনির (Pliny) মতে– গঙ্গানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। গ্রিক লেখকগণ গঙ্গারিডই ছাড়াও প্রাসিঅয় (Prasioi) নামক আরেক জাতির উল্লেখ করেছেন। এদের রাজধানী ছিল পালিবোথরা (পাটালিপুত্র) তথা বর্তমান পাটনা। এরা সম্ভবত গঙ্গারিডই দেশের পশ্চিমে বসবাস করত। ডিওডোরাস এই উভয় জাতিকে অভিন্ন জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কার্টিয়াস (Curtius) অবশ্য পৃথক বলেই বর্ণনা করেছেন। প্লুতার্ক (Plutarch) এক স্থানে উভয় জাতিকে গঙ্গারিডই রাজার, অন্য স্থানে দুই পৃথক রাজার অধীন বলেছেন। যাই হোক, এই উভয় জাতি একই রাজার নেতৃত্বে যুগ্মভাবে অথবা দুই পৃথক রাজার নেতৃত্বে পৃথকভাবে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। আলেকজান্ডার রাজ্য জয় করতে করতে বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন– গঙ্গারিডই ও প্রাসিঅয় রাজ্যের রাজা অথবা রাজাগণ বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ তাঁকে বাধা প্রদানে প্রস্তুত রয়েছেন। এই সংবাদে ভীত গ্রিক সৈন্যরা আর অগ্রসর হতে চায়নি। অগত্যা আলেকজান্ডার সেখান থেকেই স্বদেশাভিমুখে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

মৌর্য যুগ

আলেকজান্ডারের প্রস্থানের পর মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান নিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রিক ও বৌদ্ধ গ্রন্থকারদের বর্ণনা অনুযায়ী– বাংলার উত্তরাঞ্চল এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা তথা নদী বিধৌত ব-দ্বীপ অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কার্টিয়াস-এর মতে– গঙ্গারিডই রাজ্যটি মগধের রাজা এ্যাগ্রামেস বা ধননন্দের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মগধের নন্দবংশের সিংহাসন দখল করলে বাংলা স্বাভাবিকভাবেই মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর পরিভ্রমণের সময় পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ– এই চারটি রাজ্যের সঙ্গে বাংলাকে সম্রাট অশোকের (২৭৩-২৩২ খ্রি.পূ.) সাম্রাজ্যভুক্ত একটি প্রদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এসব অঞ্চলে অশোকের আমলে নির্মিত বহু স্তম্ভ ও বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করেছিলেন। হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা প্রামাণিক সত্য বলে ধরে নিলে বলতে হয়– উত্তরবঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য জনপদে মৌর্যশাসন বিদ্যমান ছিল। তৃতীয়ত, বগুড়ার মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত চুনাপাথরের উপর ব্রাহ্মীলিপিতে প্রাকৃত ভাষায় খোদিত সম্রাট অশোকের আমলের একটি শিলাখণ্ডে বাংলায় মৌর্যশাসনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিক থেকে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে গুপ্ত আমলে বাংলার অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। গুপ্তবংশের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত এসময় কোনো ক্ষুদ্র রাজ্যের

রাজা ছিলেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ ভারতবর্ষে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, শ্রীগুপ্ত মগধে রাজত্ব করতেন। কিন্তু চীনা পরিব্রাজক ইৎ সিং লিখেছেন– 'মহারাজ শ্রীগুপ্ত চীনদেশীয় শ্রমণদের জন্য মৃগস্থাপন স্তূপের নিকটে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।'[৫] মৃগস্থাপন স্তূপটি বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। সুতরাং শ্রীগুপ্ত বরেন্দ্র বা তার নিকটবর্তী কোনো রাজ্যে রাজত্ব করতেন বলে মনে হয়। শ্রীগুপ্ত ও তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায় না। ঘটোৎকচের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ও পৌত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিভিন্ন রাজ্য জয় করে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও পুত্র সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় বাংলায় অনেকগুলো স্বাধীন রাজ্য ছিল। সমুদ্রগুপ্ত পুষ্করণের রাজা চন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করে পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করেন। বাংলার পূর্বভাগের সমতট অঞ্চল সমুদ্রগুপ্তের অধীনস্ত করদ রাজ্যে পরিণত হয়। সম্ভবত উত্তরবঙ্গও গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত কুমারগুপ্তর আমলের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির উল্লেখ আছে– যা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত জনৈক শাসক শাসন করতেন। গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

অন্তর্বিদ্রোহ ও হুন জাতির ক্রমাগত আক্রমণে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গুপ্তসম্রাটগণ হীনবল হয়ে পড়লে বাংলার রাজাগণ পুনরায় স্বাধীন হয়ে ওঠেন। পুণ্ড্রবর্ধনের শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সমতটের রাজা বৈন্যগুপ্তও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করে স্বাধীনভাবে রাজ্য চালাতে থাকেন। এসময় যশোবর্মণ নামক জনৈক দুর্ধর্ষ বীর উত্তরভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সমসাময়িক অবস্থার প্রেক্ষিতে গুপ্তসাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে বাংলায় দুটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় বঙ্গরাজ্য, আর উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল সমন্বয়ে হয় গৌড়রাজ্য।

স্বাধীন বঙ্গরাজ্য: ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় পাঁচটি ও বর্ধমানের মল্লসারুলে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের তথ্য পাওয়া যায়। যেগুলোতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামক তিন জন রাজার নাম রয়েছে। তাঁরা সকলেই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করে পর্যায়ক্রমে বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। অবশ্য ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মণ ও কম্বোজরাজ স্রংসান গ্যাম্পোর আক্রমণে বঙ্গরাজ্যের পতন ঘটে। কিংবা গৌড়রাজ শশাঙ্কের ক্ষমতা বিস্তারের ফলেও এর পতন হয়ে থাকতে পারে।

স্বাধীন গৌড়রাজ্য: শশাঙ্ক নামক জনৈক সামন্ত ৬০৬ সালে গুপ্তবংশীয় শাসকের নিকট থেকে গৌড় দখল করে স্বাধীন গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্কর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। শশাঙ্ক প্রথম থেকেই স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তারে সচেষ্ট হন এবং অল্প সময়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মৌখরিরাজশক্তিকে স্বীয় কূটনীতি ও বাহুবলে সমূলে ধ্বংস করেন। উত্তরভারতের পরাক্রমশালী সম্রাট হর্ষবর্ধন এবং কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখেন। ৬৩৭ সালে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। এসময় অভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহ, ক্ষমতা দখলে পারস্পরিক সংঘর্ষ প্রভৃতি কারণে শশাঙ্কের সুসংহত রাজ্যটি ভেঙে যায়। পুত্র মানবদেব ক্ষমতা গ্রহণ করার কয়েক মাসের মধ্যে তাঁকে পরাস্ত করে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণ গৌড়রাজ্য ভাগ করে নেন। ৬৪৭ সালে হর্ষবর্ধনের

মৃত্যুর পর জয়নাগ নামক জনৈক ব্যক্তি গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন এবং ভাস্করবর্মণের কর্তৃত্ব থেকে কর্ণসুবর্ণ পুনরুদ্ধার করেন। রাজা জয়নাগের মৃত্যুর পর বাংলায় ঘোর অরাজকতা দেখা দেয়। এই সুযোগে উত্তরবঙ্গে তিব্বতী আক্রমণ শুরু হয়। হিমালয়বাসী শৈলবংশ পুণ্ড্রদেশ জয় করেন। ৭২৫ থেকে ৭৩৫ সালের মধ্যে কম্বৌজের রাজা যশোবর্মণ পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ অধিকার করেন। ফলকথা, রাজা শশাঙ্ক ও সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর অভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহ, বহিঃআক্রমণ প্রভৃতি কারণে পুণ্ড্র, গৌড়সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এসময় থেকে পালবংশের উত্থান পর্যন্ত শতাব্দীকাল রাজ্যব্যাপী হত্যা, লুণ্ঠন, দুর্বলের উপর অত্যাচার নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। অরাজকতা ও কুশাসন স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়। বহু বছর ধরে চলা নৈরাজ্যকর সংঘাতময় সেই দুঃসহ সময়কে 'মাৎস্যন্যায় যুগ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে লামা তারনাথের বর্ণনায় ও অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে। 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে' বলা হয়েছে, 'দণ্ডধরের অভাবে যখন বলবান দুর্বলকে গ্রাস করে, অর্থাৎ মাছের রাজত্বের মতো, সেখানে বড় মাছ ছোট মাছকে ভক্ষণ করে। প্রায় শতবর্ষব্যাপী অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর পুনঃপুন আক্রমণের ফলে বাংলার রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে কোনো শাসনব্যবস্থাই বিদ্যমান ছিল না বললেও ভুল হবে না।'[৬]

পাল রাজবংশ

গোপাল: বাংলার বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মুক্তির আশায় রাজপদে কাউকে নির্বাচিত করবে এবং পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে সকলেই তার বশ্যতা স্বীকার করে নেবে– এমন সিদ্ধান্তে দেশের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ঐকমত্য পোষণ করেন। জনসাধারণও সানন্দে এই মত গ্রহণ করে। এরই প্রেক্ষিতে ৭৫০ সালে গোপাল নামক এক ব্যক্তি বাংলার রাজপদে নির্বাচিত হন। পালবংশের বা গোপালের আদি বাসস্থান উত্তরবঙ্গে ছিল এবং এ অঞ্চলেই তারা সর্বপ্রথম ক্ষমতা বিস্তার করেন। গোপাল অচিরেই দেশের অরাজকতা দূর করে সুশাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট স্বীয় দায়িত্ববোধের পরিচয় দেন। তিনি নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহারসহ রাজ্যব্যাপী বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

ধর্মপাল: গোপালের মৃত্যুর পর আনুমানিক ৭৭০ সালে পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় সমগ্র আর্যাবর্তে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুদ্র পালরাজ্যকে বৃহৎ সাম্রাজ্যে উন্নীত করেন। 'গোপাল বাংলা ও বিহারের একাংশে যে পালরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন ধর্মপাল সেই রাজ্যকে বিস্তৃত ও শক্তিশালী করে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর শত্রুতাকে ভ্রুকুটি করে নিজ সাম্রাজ্যকে তিনি একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।'[৭] পিতার ন্যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে তিনিও বিহার নির্মাণ করেন। সোমপুরের বিশ্বখ্যাত পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার ধর্মপালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

দেবপাল: ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল আনুমানিক ৮১০ থেকে ৮৫০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এসময় পাল সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে। বলা যায়– এক চরম অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে গোপাল পালবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আর ধর্মপাল ও দেবপাল পাল সাম্রাজ্যকে সুবিস্তৃত করেন, সমগ্র ভারতবর্ষে বাংলার গৌরব পরিব্যাপ্ত করেন।

এই তিন জনের শতবর্ষের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাগণ নিজ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি অন্য ধর্মের প্রতিও সশ্রদ্ধ উদারতা দেখান এবং সকলের সুষ্ঠুভাবে স্ব-স্ব ধর্মাচার পালনের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন।

দেবপালপরবর্তী রাজাগণের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। পরবর্তী তিন শত বছর কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বর্ণিত 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'য় অগ্রসর হয়ে অবশেষে রাজবংশটি ধ্বংস হয়। অবশ্য দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালই কেবল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অংশকে পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। অন্যদিকে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপালের প্রশাসনিক দুর্বলতা, অযোগ্যতা, অত্যাচার ও কুশাসনে রাজ্যময় সংকট সৃষ্টি হলে কৈবর্তবংশীয় দিব্য নামক জনৈক সামন্তের নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। রাজা মহীপাল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে দিব্য রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (আনুমানিক ১০৭১ খ্রি.)। ইতিহাসে এটিই বরেন্দ্রে 'প্রথম সামন্ত বিদ্রোহ' নামে পরিচিতি পায়। তবে মহীপালের ভ্রাতা রামপাল পরবর্তী সময়ে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। তাঁর রাজত্বকালে (১০৮২-১১২৪ খ্রি.) পালসাম্রাজ্য শেষবারের মতো উজ্জীবিত হয়।

সেন রাজবংশ

বিজয়সেন: উত্তরবঙ্গে সামন্ত বিদ্রোহে পাল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ায় রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাল বংশের উচ্ছেদ করেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ থেকে বর্মশাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়সেনের আমলের প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন ও শিলালিপি থেকে জানা যায়– বিজয়সেন ১০৯৮ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রামপাল ১১২৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং বিজয়সেন ১০৯৮ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করলে রাজত্বের প্রথম বত্রিশ বছর হয়তো তিনি কোনো ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন, নয়তো ঐসময় রামপালের অধীনস্থ সামন্ত রাজা ছিলেন। দিব্য রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করলে রামপাল বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধারে অন্য যেসমস্ত সামন্তরাজের সাহায্য পেয়েছিলেন– তাঁদের একজন ছিলেন নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ। পণ্ডিতগণ বিজয়রাজকেই বিজয়সেন বলে মনে করেন। রাজশাহীর দেওপাড়া নামক স্থানে প্রাপ্ত আরেকটি শিলালিপি থেকে জানা যায়– বিজয়সেন সেখানে প্রদ্যুম্নেশ্বরের এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করেন। এর থেকে প্রমাণিত হয়– বরেন্দ্রর অন্তত এক অংশে বিজয়সেনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলার ইতিহাসে বিজয়সেনের রাজত্ব এক গৌরবময় অধ্যায়। সুদীর্ঘ বাষট্টি বছরের শাসনামলে তিনি সাম্রাজ্যব্যাপী সুখ-সমৃদ্ধি ও সুশাসন পতিষ্ঠা করেন।

বল্লালসেন: বিজয়সেনের মৃত্যুর পর ১১৬০ সালে বল্লালসেন পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। নৈহাটিতে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন, ভাগলপুরের সনোখার গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপি ও নিজের রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক দুইটি গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্বকালের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বল্লালসেন পালরাজ গোবিন্দপালকে পরাজিত করে পালশাসনের চির অবসান ঘটান এবং সমগ্র বঙ্গে সেন আধিপত্য বিস্তৃত করেন। কুড়ি বছরের

শাসনামলে বল্লালসেন সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্বান ও পণ্ডিত হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে– তিনি তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের অনুসারী ছিলেন। বল্লালসেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য বিস্তারে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে বাংলায় কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তকও বলা হয়। 'ড. নিহাররঞ্জন রায়ের মতে, বল্লালসেন ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল। তিনি সমাজের উঁচু শ্রেণির মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করে জাতিভেদ প্রথা তীব্রতর করেন।'[৮] বৃদ্ধবয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি সস্ত্রীক বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে শেষজীবন অতিবাহিত করেন।

লক্ষ্মণসেন: ১১৭৮ সালে ষাট বছর বয়সে লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় লক্ষ্মণসেনও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং বাল্যকাল থেকেই রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রায় ছাব্বিশ বছর রাজত্ব শেষে অশীতিপর লক্ষ্মণসেন স্বভাবতই দুর্বল হয়ে পড়েন। পিতার মতোই গঙ্গাতীরে অবস্থানের উদ্দেশ্যে অস্থায়ী রাজধানী নবদ্বীপ গমন করেন। এই সময় শাসনকার্যে শৈথিল্য ও দুর্বলতার সুযোগে অভ্যন্তরীণ বিপ্লব দেখা দেয় এবং সাম্রাজ্যের অনেক এলাকা স্বাধীন হতে থাকে। অন্যদিকে দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির উত্থান ঘটে– যা সেন সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি হিসেবে ১২০৪ সালে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী আকস্মিকভাবে নদীয়া আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণসেন এমন আক্রমণ প্রতিহত সম্ভব নয় ভেবে নদীপথে সপরিবার দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার আরেক অস্থায়ী রাজধানী বিক্রমপুরে পলায়ন করেন এবং এখানে অবস্থান করে আরো কিছু সময় রাজত্ব শেষে সম্ভবত ১২০৬ খিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ এই অঞ্চলে অন্তত ১২৬০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এর পর দেববংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যে বংশ ছিল এই অঞ্চলের সর্বশেষ হিন্দু রাজবংশ।

মুসলিম শাসন

সুলতানি আমল: মাত্র সতের জন ছদ্মবেশী অশ্বারোহী সৈন্যের একটি অগ্রবর্তী দল নিয়ে বখতিয়ার খলজী অতর্কিতে নদীয়ায় অবস্থানরত লক্ষ্মণসেনের অরক্ষিত রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন। তাতার দেশীয় আরব অশ্ববিক্রেতার পরিচয় দিয়ে বিনা বাধায় প্রাসাদে উপস্থিত হন ও প্রাসাদ-রক্ষীদের হত্যা করেন। লক্ষ্মণসেন সবেমাত্র মধ্যাহ্নভোজে বসেছেন। তুর্কিদের এই আকস্মিক আক্রমণের সংবাদে হতচকিত বৃদ্ধরাজা প্রাসাদের পেছনদরজা দিয়ে বের হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে মূল বাহিনী এসে যুক্ত হলে বখতিয়ারের নদীয়া বিজয় সম্পন্ন হয়। অতঃপর বখতিয়ার নদীয়া ত্যাগ করে রাজধানী লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) অভিমুখে অগ্রসর হন। দুর্গপ্রাকার সমন্বিত সুরক্ষিত গৌড় নগরীতেও একরকম বিনাযুদ্ধেই মুসলিম বাহিনী প্রবেশ করে। বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতী জয় করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। মুসলমান আমলে এটিই 'লখনৌতি' নামে পরিচিতি পায়। গৌড় জয়ের পর বখতিয়ার আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করেন। অধিকৃত অঞ্চলকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের

শাসনভার একজন সেনাধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত করেন। বখতিয়ার খলজীর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সঠিক সীমা সসম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না। 'সম্ভবত তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মানদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বখতিয়ার কর্তৃক পূর্বঅধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'[৯] ১২০৬ সালে বখতিয়ার তিব্বত অভিযানে বের হন এবং ব্যর্থ অভিযান শেষে ফেরার পথে দেবকোটে মৃত্যুবরণ করেন। বখতিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয়ের ফলে এদেশে মুসলিম শাসন সাড়ে পাঁচ শত বছর (১২০৪-১৭৫৭ খ্রি.) স্থায়ী হয়।

১২০৬ থেকে ১২২৭ সাল পর্যন্ত বখতিয়ার খলজীর তিন জন সহচর মালিক মুহম্মদ শিরান খলজী, মালিক মুহম্মদ আলী মর্দান খলজী ও সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজী বঙ্গদেশ শাসন করেন। এ সময়ে খলজী মালিকগণের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় এবং এরই সুযোগে দিল্লির সুলতান ইলতুতমিস বারংবার বঙ্গ অধিকারের প্রচেষ্টা চালান। ১২২৭ সালে ইলতুতমিসের জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদ লখনৌতির সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজীকে পরাজিত ও হত্যা করে বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তখন থেকে শুরু করে ১২৮৭ সালে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের মৃত্যু পর্যন্ত লখনৌতি দিল্লির অধীনে ছিল। বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদ বুঘরা খান নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। বুঘরা খানের পর পুত্র রুকনউদ্দীন কায়কাউস ১২৯১ সালে পিতার ইচ্ছায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। কায়কাউসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লখনৌতির বলবনি বংশের রাজত্ব শেষ হয়। এরপর সুলতান শামসউদ্দীন ফিরূজ শাহ ১৩০১ থেকে ১৩২২ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। ফিরূজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ফিরূজ শাহের আরেক পুত্র নাসিরউদ্দীন ইব্রাহিম বড়ভাই বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সুলতান পালকপুত্র বাহরাম খানের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে বাহাদুর শাহ পরাজিত হন এবং পূর্ববঙ্গের দিকে পলায়নরত অবস্থায় বন্দি হন। নাসিরউদ্দীন ইব্রাহিম দিল্লির অধীনস্ত শাসক হিসেবে লখনৌতির সিংহাসনে আসীন হন। পুনরায় বাংলায় দিল্লির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটান। তিনি গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহকে মুক্তি দিয়ে কয়েকটি শর্ত দিয়ে সোনারগাঁও-এ বাহরাম খানের সঙ্গে যুগ্মভাবে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেন। মালিক পিন্দর খলজীকে কদর খান উপাধি দিয়ে লখনৌতির দায়িত্ব দেন। মালিক ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়াকে আজম মালিক উপাধি দিয়ে দায়িত্ব দেন সাতগাঁও-এর এবং নাসিরউদ্দীন ইব্রাহিমকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ দিল্লির আনুগত্য মেনে কিছুদিন শাসন করলেও স্বীয় পুত্র মুহম্মদকে দিল্লির দরবারে প্রেরণের শর্ত ভঙ্গ করেন। সুলতান এই বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করলে তিনি ১৩২৮ সালে সোনারগাঁও-এ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বনামে মুদ্রা জারি করেন। এই বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে বাহরাম খান বাহাদুর শাহকে আক্রমণ করেন এবং পরাজিত করে নির্মমভাবে হত্যা করেন। '....বাহরাম খানের সংবাদদাতা সুলতানকে বাহাদুরের পরাজয় ও হত্যার সংবাদ দেন। সংবাদদাতা আরও জানান যে বাহাদুরের হত্যার পরে তাঁহার চামড়া

খুলিয়া ফেলা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুরের চামড়া সুলতানের সম্মুখে রাখেন। সুলতান অত্যন্ত খুশি হইলেন এবং আদেশ দিলেন যেন বাহাদুরের চামড়া বিজয়স্তম্ভে ঝুলাইয়া রাখা হয়।'[১০] বাহরাম খান দশ বছর সোনারগাঁও-এর একক শাসনকর্তা হিসেবে অতিবাহিত করেন।

১৩৩৮ সালে বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর সিলাহদার (বর্মরক্ষক) ফখরউদ্দীন 'সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ' উপাধি ধারণ করে সোনারগাঁও-এর পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। লখনৌতি ও সাতগাঁও-এর শাসনকর্তাদ্বয় কদর খান ও আজম মালিক এবং মালিক হুমামউদ্দীন আবু রেজা ও কারামানিকপুরের শাসনকর্তা আমির ফিরূজ খান সম্মিলিতভাবে সোনারগাঁও আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ফখরউদ্দীন পরাজিত হয়ে সসৈন্যে ভুলুয়াতে আশ্রয় নেন। সুযোগ বুঝে ফখরউদ্দীন পুনরায় সোনারগাঁও-এ উপস্থিত হন। কদর খানকে উৎখাত করে ফখরউদ্দীন সোনারগাঁও পুনরুদ্ধার করেন। তিনি ১৩৪৯ সাল পর্যন্ত এগার বছর রাজত্ব করে অবসর নিলে পুত্র ইখতিয়ারউদ্দীন 'গাজী শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্যদিকে কদর খানের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাধ্যক্ষ আলী মোবারক 'সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ' উপাধি গ্রহণ করে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতোমধ্যে হাজি ইলিয়াস নামক এক ব্যক্তি বঙ্গের রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। প্রথমে তিনি সাতগাঁও-এর এবং পরে আলাউদ্দীন আলী শাহকে হত্যা করে ১৩৪২ সালে ফিরূজাবাদের (পাণ্ডুয়া) সিংহাসন দখল করেন। উল্লেখ্য, সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ লখনৌতি থেকে ফিরূজাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। হাজি ইলিয়াস 'সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ' উপাধি ধারণ করেন। তিনি আরও পরে ১৩৫২ সালে গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁও অধিকার করে সমগ্র বঙ্গে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তুঘলক শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

বলা যায়, সোনারগাঁও-এর ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ বাংলায় স্বাধীন সুলতানির সূচনা করেন। পরবর্তী কালে আলাউদ্দীন আলী শাহের লখনৌতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা ও শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের আবির্ভাব এখানকার স্বাধীন শাসনের ভিতকে আরও দৃঢ় করে। ইলিয়াস শাহ-ই সমগ্র বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠাপর্ব সম্পন্ন করেন। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর (১৩৫৮ খ্রি.) পুত্র সুলতান সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-৯৩ খ্রি.), সিকান্দর শাহকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসা পুত্র সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১১ খ্রি.) সহ অন্যান্য সুলতানগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁরা গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের পূর্ণ সমর্থন লাভে সক্ষম হন। এর ফলে দিল্লির আক্রমণ প্রতিহত করার মতো সাহস-শক্তি সঞ্চিত হয়। তুঘলক শাসনের অবসানের পর দিল্লির সুলতানগণের দুর্বলতা এবং বাংলার সুলতানগণের সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থায় বাংলার এই স্বাধীনতা সুদীর্ঘ দুই শত বৎসর (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.) স্থায়ী হয়। ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ ছাড়াও এই সময়ের মধ্যে রয়েছেন রাজা গণেশ ও তাঁর উত্তরসূরিগণ, হাবশিগণ এবং সর্বশেষে হোসেন শাহী বংশের সুলতানগণ। যাঁদের দ্বারা বাংলায় অখণ্ড ও সার্বভৌম রাজশক্তি গড়ে উঠে। প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বাংলার স্বাধীন সত্তা ও ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান উদারতা প্রদর্শন করে সুলতানগণ এই সময়ের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

আফগানী আমলঃ হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে শের খান সূর গৌড় অধিকার করে বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন (এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রি.)। রাজ্যহারা যুদ্ধাহত সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ শের খানের বিরুদ্ধে দিল্লির মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে হুমায়ুন গৌড় অভিযানে বের হন। হুমায়ুন বাংলায় প্রবেশ করে একরকম বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন (সেপ্টেম্বর, ১৫৩৮ খ্রি.)। হুমায়ুন জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে শের খান হুমায়ুনকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসেন। এ যুদ্ধে হুমায়ুনের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। যুদ্ধে জয়লাভ করে শের খান বাংলার দিকে অগ্রসর হন এবং অবিলম্বে গৌড় পুনরুদ্ধার করে 'ফরিদউদ্দীন আবুল মুজাফফর শের শাহ' উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। শের শাহকে উৎখাত করার লক্ষ্যে হুমায়ুন কনৌজের নিকট বিলগ্রাম নামক স্থানে আরো এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং আবারো পরাজিত ও বিতাড়িত হন। বিলগ্রামের যুদ্ধে জয়লাভ করে শের শাহ ভারতবর্ষের সম্রাট হন। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খান সূর ইসলাম শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১৫৪৫-৫৩ খ্রি.) বাংলা দিল্লির অধীনে ছিল। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে আফগানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে বাংলার শাসনকর্তা মুহম্মদ খান সূর 'শামসউদ্দীন মুহম্মদ শাহ সূর' উপাধি ধারণ করেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুহম্মদ শাহ সূর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে চুনার, জৌনপুর ও কালপী অধিকার করেন। কিন্তু তিনি মুহম্মদ আদিল শাহ সূরের সেনাপতি হিমুর হাতে ছাপ্পারঘাটার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (১৫৫৫ খ্রি.)। আদিল শাহ শাহবাজ খানকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অন্যদিকে মুহম্মদ শাহ সূরের পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ সুরজগড়ের নিকট এক যুদ্ধে আদিল শাহকে পরাজিত ও হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন এবং শাহবাজ খানকে পরাজিত করে গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করে নিজকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন (১৫৫৭ খ্রি.)। বিতাড়িত হুমায়ুন আফগান সুলতান সিকান্দর শাহ সূরকে পরাজিত করে দিল্লিতে পুনঃঅধিষ্ঠিত হন (১৫৫৬ খ্রি.)। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সূর বংশীয় আফগান নেতৃত্ব উৎখাতে অগ্রসর হন। কূটকৌশলী গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ মুঘলদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করে ১৫৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এর পর তাঁর ভাই জালালউদ্দীন শাহ দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন নাম গ্রহণ করে ক্ষমতায় আসীন হন। ১৫৬৩ সালে দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র (নাম অনুল্লেখিত) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু জনৈক আফগান দলপতি দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করে তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মাত্র এক বছরের মাথায় আরেক আফগান দলপতি তাজ খান কররানী তৃতীয় গিয়াসউদ্দীনকে উৎখাতের মাধ্যমে সিংহাসন অধিকার করে বাংলায় কররানী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৫৬৪ খ্রি.)। তাজ খান কররানীর মৃত্যুর পর ভ্রাতা সুলায়মান খান কররানী বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ শাসক ছিলেন। শের শাহের মতো আফগানদের সংগঠিত করে তিনি বাংলা-বিহারে একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন, 'আফগানরা দলে দলে সুলায়মান কররানীর নেতৃত্ব গ্রহণ

করে এবং তিনি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হন।'[১১] তিনি পুত্র বায়াজিদ ও দুর্ধর্ষ সেনাপতি কালাপাহাড়ের[১২] অধীনে অভিযান প্রেরণ করে উড়িষ্যাসহ কুচবিহারের কিছু অঞ্চল দখল করেন। সম্রাট আকবরের সঙ্গে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে কররানী রাজ্যকে মুঘল আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখেন। ১৫৭২ সালে সুলায়মান কররানীর মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে দলাদলি ও গৃহবিবাদ শুরু হয়। অবশেষে উজির লোদী খানের সহায়তায় সুলায়মানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদ খান কররানী সিংহাসনে আসীন হন।

মুঘল আমল: কররানী বংশের শেষ শাসক দাউদ খান কররানীর অযোগ্যতা, অপরিণামদর্শিতা, পিতা সুলায়মান কররানীর (১৫৬৫-৭২ খ্রি.) মুঘল সম্রাট সম্পর্কে অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয় সম্রাট আকবরের বাংলা আক্রমণের ক্ষেত্র তৈরি করে। পিতা হুমায়ুনের সাম্রাজ্যভুক্ত রাজ্যগুলোর পুনরুদ্ধার এবং সমগ্র ভারতর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা আকবরের লক্ষ্য ছিল। আবার আফগান নেতৃত্ব ছিল বরাবরই মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। এ সমস্ত কারণে সম্রাট আকবর দাউদ খানের বিরুদ্ধে অভিযানের নির্দেশ দেন। ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান পরাজিত ও নিহত হন। বাংলায় মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে বহু বছর যাবত মুঘল শাসন এ দেশে দৃঢ় হতে পারেনি। ফলে কেবল রাজধানী রাজমহল ও সেনানিবাস নিকটবর্তী এলাকা ব্যতীত সর্বত্র চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরাজিত আফগান পাঠানদের একটি অংশ এসবের সঙ্গে জড়িত হয়। তাঁরা 'জোর যার মুলুক তার' নীতি অনুসরণ করে পার্শ্ববর্তী এলাকা দখলে নিয়োজিত হন। এমনকি 'তাঁরা সম্মিলিতভাবে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সম্রাট আকবরের খ্যাতনামা সেনাপতিদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন এবং তাঁদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। এই জমিদাররা বার ভূঁইয়া নামে খ্যাত। তাঁদের আমলে বাংলাদেশ 'বার ভূঁইয়ার মুলুক' নামে অভিহিত হয়।'[১৩] বার ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন সোনারগাঁওয়ের জমিদার ঈসা খান ও পুত্র মুসা খান। এছাড়াও বিক্রমপুরের (শ্রীপুর) জমিদার চাঁদ রায় ও কেদার রায়, বাখরগঞ্জ অঞ্চলের কন্দর্পনারায়ণ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভূষণার (ফরিদপুর) মুকুন্দরাম ও পুত্র সত্রজিৎ, ফতেহবাদের মজলিশ কুতব, ভুলুয়ার (নোয়াখালী) লক্ষ্মণমাণিক্য, চন্দ্রদ্বীপের (বরিশাল) পরমানন্দ রায়, বুকাইনগরের (শ্রীহট্ট) উসমান খান লোহানী, শাহজাদপুরের (পাবনা) রাজা রায়, বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) বীর হামির, বীরভূমের শামস খান, হিজলীর তাজ খান ও সলিম খান প্রমুখ বিখ্যাত ছিলেন। বার ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় মুঘল শাসন নিরাপদ করার লক্ষ্যে আকবর ১৫৮৩ সালে সেনাপতি শাহবাজ খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। শাহবাজ খান ঈসা খান ও বিদ্রোহী মুঘলনেতা মাসুম খান কাবুলীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হন। শাহবাজ খানের পরেও একাধিক সুবাদার একইভাবে ব্যর্থ হলে অবশেষে আকবর কূটনৈতিক পদক্ষেপে কিছুটা সাফল্য আনেন। অনেক বিদ্রোহী বশীভূত হয়। ঈসা খান আপাতত দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করে উত্তরবঙ্গের অধিকৃত স্থানসমূহ ছেড়ে দেন (১৫৮৬ খ্রি.)। পরবর্তী সময়ে আফগান ও জমিদারগণ আবারও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। রাজা মানসিংহ বাংলার সুবাদার হয়ে এসে রাজধানী তাণ্ডায় পৌঁছেই বিদ্রোহ দমনে নানা স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ঈসা খান ও মাসুম কাবুলীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ঈসা খান এবারও সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারপূর্বক সন্ধি করেন (১৫৯৭ খ্রি.)। এর দুই বছর পর ঈসা

খানের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র মুসা খান নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বারংবার বাংলায় আফগান ও স্থানীয় জমিদারগণ বিদ্রোহ করে দিল্লির আধিপত্যকে উপেক্ষা করেন।

পিতা আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাংলার বিদ্রোহ দমনে অবশেষে ইসলাম খানকে সুবাদার নিযুক্ত করেন (১৬০৮ খি.)। সুবাদার ইসলাম খানের পাঁচ বছরের শাসনামলেই কার্যত বিদ্রোহ দমন হয়। তিনি সুকৌশলে মুসা খান ও তাঁর মিত্রদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের পরাজিত করে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। উল্লেখ্য, ১৬১০ সালে ইসলাম খান বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করে 'জাহাঙ্গীর নগর' নামকরণ করেন। এখান থেকে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা সহজতর হয়। মূলত ইসলাম খানই বারভূঁইয়া ও পাঠানদের কবল থেকে মুক্ত করে সমগ্র বাংলায় মুঘল রাজশক্তি সুদৃঢ় করেন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বীয় দক্ষতা, সাহসিকতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। সম্রাট আকবরের সময় বাংলা জয় হলেও প্রকৃত জয়ের গৌরব ইসলাম খানেরই প্রাপ্য। বলা যায়– সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খান প্রতিষ্ঠিত মুঘল শাসনের দৃঢ় ভিত্তিমূলে বাংলার সুবাশাসন সম্রাট শাহজাহানের আমল (১৬২৮-৫৭ খ্রি.) হয়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭ খ্রি.) পর্যন্ত পরবর্তী এক শত বছর মোটামুটি নিরাপদ হয়। বিশেষত ইসলাম খান মাসহাদী, শাহজাদা সুজা, মীরজুমলা, শায়েস্তা খান প্রমুখ সুবাদারগণের দূরদর্শিতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, প্রজাহিতৈষণা এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়।

নবাবী আমলঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দিল্লির অকর্মণ্য সম্রাটগণের দুর্বলতা ও আত্মকলহে মুঘল সাম্রাজ্যে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। এমন অবস্থায় মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবাদার বা নবাব নিযুক্ত হন (১৭১৭ খি.)। তিনি স্বীয় নামানুসারে মখসুদাবাদের নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ এবং সুবাবাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। শুরু হয় নবাবী আমল। সুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান (১৭২৭ খি.), সরফরাজ খান (১৭৩৯ খি.), আলীবর্দী খান (১৭৪০ খি.), সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬ খ্রি.) প্রমুখ নবাবগণ বাংলা শাসন করেন। মুর্শিদকুলী খানসহ পরবর্তী নবাব সুবাদারগণ মুঘল শাসনব্যবস্থার অনুকরণে প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করেন। বাদশাহী আমলে সুবাদারসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সম্রাট নিয়োগ দিতেন। কিন্তু দিল্লির সঙ্গে পূর্বেকার যোগসূত্র না থাকায় পরবর্তী সময়ে নবাবগণই স্থানীয় বাঙালির মধ্য থেকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ করতেন এবং উত্তরাধিকারী মনোনীত করে সম্রাটের অনুমোদন নিতেন। 'বস্তুত সম্রাটের কোনো ক্ষমতা ছিল না। নবাবগণ তাঁদের ক্ষমতা শুধু আইনগত করার জন্য সম্রাটের ফরমান ও অনুমোদনের মুখাপেক্ষী ছিলেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁকে বার্ষিক ১ কোটি ৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব নজরানা স্বরূপ পাঠাতেন।'[১৪] তবে নীতিগতভাবে তাঁরা মুঘল সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতেন। নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে মসনদে আরোহণ করেন। সিরাজের নবাব হওয়ায় ক্ষুব্ধ হন তাঁর নিকটাত্মীয় ঘসেটি বেগম, শওকত জঙ্গ, মীরজাফর আলী খানসহ অনেকে। তাঁরা সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের নবাবের প্রতি ঔদ্ধত্য ও

অবহেলা প্রদর্শন, নিষেধ সত্ত্বেও নানা স্থানে দুর্গ নির্মাণসহ বিভিন্ন কারণে সিরাজ তাদের কঠিনভাবে শায়েস্তা করেন। ফলে তারাও সিরাজের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ সসৈন্যে নবাবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগীরথীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। সমরাস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যায় বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভের চক্রান্তে নবাব-বাহিনীর পরাজয় ঘটে এবং ২ জুলাই মীরজাফর-পুত্র মীরনের নির্দেশে মুহম্মদী বেগ কর্তৃক সিরাজ মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। এদেশীয় কতিপয় সুবিধাভোগী মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে বাংলার নবাবী শাসনের।

ব্রিটিশ শাসন

দ্বৈতশাসন, দেওয়ানি, দুর্ভিক্ষ ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত: পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর দৃশ্যত মীরজাফর নবাব হন। তবে ইংরেজরাই বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হয়। ১৭৬৫ সালে মীরজাফরের মৃত্যু হলে এবং দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করায় ইংরেজ কোম্পানি এতদঅঞ্চলের অর্থ-সম্পদ, সামরিক শক্তি, শাসন-ক্ষমতা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রক হয়ে পড়ে। বলা যায়– এসময় থেকে বাংলায় কার্যত নবাবের রাজত্ব শেষ হয়ে কোম্পানির রাজত্ব শুরু হয়। বিশেষত পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে রবার্ট ক্লাইভ ইংরেজ কর্তৃত্বের যে সূচনা করেন, আট বছর পর দ্বিতীয়বার গভর্নর হয়ে এসে তিনি সেই কর্তৃত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবর্তন করেন দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা। যাতে নবাবের দায়িত্ব ছিল, ক্ষমতা ছিল না। অপর পক্ষে কোম্পানির দায়িত্ব ছিল না, ছিল অসীম ক্ষমতা ও অফুরন্ত অর্থ-সম্পদ। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা দেশবাসীর জন্য চরম অভিশাপ হয়ে ওঠে। কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি, অত্যাচার, রাজস্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে দেশের অর্থনীতি ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ে। গভর্নর ভেরেলস্ট ও কার্টিয়ার-এর আমলে বাঙালির দুর্দশা চরমে ওঠে। কোম্পানির কর্মচারী ও বণিক এবং নীলকরদের অর্থলালসায় ঐশ্বর্যশালী বাংলা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। বাংলা ১১৭৬ সাল (১৭৬৯-৭০ খ্রি.) ঘটে যাওয়া 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় এক কোটি অর্থাৎ মোট অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়। অন্নাভাবে মানুষ মৃতদেহের মাংস খেয়ে জীবন ধারণের চেষ্টা করে। চার্লস গ্রান্ট মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষের দৃশ্য এইভাবে তুলে ধরেছেন–

> '....বিশেষ একদল লোক রাস্তা-ঘাট থেকে মৃতদেহ কুড়ানোর জন্য নিয়োজিত হয়। মৃতদেহ যারা কুড়ায় তারাও ক্ষুধার জ্বালায় একে একে মৃত্যুবরণ করে। ..পরিস্থিতি এমন পাশবিক যে, শিশু মৃত পিতা-মাতাকে খায়, মা তার মৃত বাচ্চাকে খায়।'[১৫]

কোম্পানির কর্মচারী ও বণিকরা এসময় মানুষের দুর্দশা লাঘবের কোনো চেষ্টা করেনি বরং দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও জোরপূর্বক রাজস্ব আদায় করে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটায়। ১৭৭২ সালে গভর্নর হয়ে এসে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত-শাসনের ফলে উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরাসরি কোম্পানির পক্ষে দেওয়ানির সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তৎকালীন বাংলার নামসর্বস্ব নবাবকে শাসনকার্য থেকে অব্যাহতি

দেয়া হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। মূলত এসময় থেকেই পূর্ণরূপে ভারতবর্ষে শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ আধিপত্য। ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময়ের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার একসালা, পাঁচসালা বন্দোবস্তের পরিবর্তে জমিদারদের মধ্যে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা চালু করেন (১৭৯৩ খি.)। ত্রুটিপূর্ণ এই ব্যবস্থা এদেশে সামন্তবাদের জন্ম দেয়, জমিদার ও রায়তদের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে, গণমানুষের জন্য অত্যাচার-যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়।

সশস্ত্র বিদ্রোহ: অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় ব্যাপক অরাজকতা তৈরি হয়। পলাশীযুদ্ধ পরবর্তী শাসন-বিশৃঙ্খলা, ফটকাবাজ-দালালদের দৌরাত্ম্য, দুর্ভিক্ষের সময়কার অব্যবস্থাপনা ও এর ফলে সৃষ্ট চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি, জমিদার কর্তৃক রায়ত ও সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যাচার, দস্যুদের আশ্রয়-প্রশ্রয় প্রদান ও তাদের দ্বারা পার্শ্ববর্তী জমিদারিতে লুটতরাজ প্রভৃতি অপরাধ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ইংরেজদের শোষণমূলক রাজস্ব-নীতি, চিরাচরিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, দেশীয় বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ ও দেশীয় রীতি-সংস্কৃতি বিরোধী কার্যকলাপ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদাসীনতা, জনগণের নিরাপত্তা বিধানে নিশ্চেষ্টতা, কৃষকদের জোরপূর্বক নীলচাষে বাধ্যকরণ প্রভৃতি কারণে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এরই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসব বিদ্রোহের মধ্যে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০ খ্রি.), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৭-৮৭ খ্রি.), রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩ খ্রি.), বলাকী শাহের বিদ্রোহ (১৭৯১-৯২ খ্রি.), পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৫-৩০ খ্রি.), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬ খ্রি.), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রি.), নীল বিদ্রোহ (১৮৬০ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সংস্কার আন্দোলন ও বাংলায় পুনর্জাগরণ: পলাশীর বিপর্যয়ের পর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ইউরোপীয় সমাজ-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বাঙালি জাতির জীবনে ছন্দপতন ঘটায়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নেমে আসে অবক্ষয়। প্রচলিত নৈতিক কাঠামো ও শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ায় বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে নানা কুসংস্কার প্রবেশ করে তাদের নৈতিক শক্তি দুর্বল করে ফেলে। জাতির এই চরম দুর্দিনে কয়েকজন মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। যাঁরা বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াস চালান। প্রথমেই হিন্দুধর্মের সংস্কারক হিসেবে রাজা রামমোহনের (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) নাম উল্লেখ করতে হয়। বহু দেব-দেবী নির্ভর পৌত্তলিকতা, অর্থহীন ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে হিন্দুধর্মকে রামমোহন বেদ ও উপনিষদের একেশ্বরবাদের ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৮২৮ খ্রি.)। এছাড়াও তিনি বর্ণভেদপ্রথা দূরীকরণ, নারীজাতির শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সতীদাহ প্রথা বিলোপসহ নানাবিধ সামাজিক সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার নামে বহুবিবাহ রদ, শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁদের মধ্যে হাজি শরিয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রি.), মুহসিনউদ্দীন আহমদ দুদুমিয়া (১৮১৯-৬২ খ্রি.) মীর নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮১-১৮৩১ খ্রি.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। শরিয়তউল্লাহ পরিচালিত আন্দোলন 'ফরায়েজি আন্দোলন' নামে পরিচিত। কুরআন-হাদিস পরিপন্থী নানা আচারানুষ্ঠান ও রীতি-নীতিতে যুক্ত হয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক অধঃপতনের দিকে ধাবিত মুসলমানদেরকে শরিয়তউল্লাহ ইসলামের মূল আদর্শ ও শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। তিনি ইংরেজ শোষণ ও জমিদার-নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে পুত্র দুদুমিয়া ফরায়েজিকে একটি শক্তিশালী সংগঠন রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। জমিদার-নীলকরদের অত্যাচার থেকে রায়ত-চাষী, প্রজা-সাধারণকে রক্ষায় দুদুমিয়া ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সংগঠন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন করে সাম্য ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে যাবতীয় বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা মিমাংসার ব্যবস্থা করেন। 'ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কোর্ট-কাচারির বিচারের তুলনায় দুদুমিয়ার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ফরায়েজি অধ্যুষিত অঞ্চলে কোর্ট-কাচারিতে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের বহুগুণে হ্রাস পায়।'[১৬] তিতুমীর পশ্চিমবঙ্গে ফরায়েজি নেতাদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের অনুরূপ আরেকটি 'প্রজা আন্দোলন' সংগঠন পরিচালনা করেন।

১৭৫৭ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর উপমহাদেশের মুসলমানরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে, ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ইংরেজরা মুসলমানদের অবিশ্বাস করে, মুসলমানরাও ইংরেজ শাসন মেনে নিতে পারেনি; তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করতে পারেনি। যদিও হিন্দুসমাজ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি ও ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। মুসলমানদের এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা তাদের জন্য অপরিহার্য– এই উপলব্ধি ও বাস্তব কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে আসেন বাংলার দুই কৃতী সন্তান নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। 'এঁদের কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে পুনর্জাগরণের সূত্রপাত হয় এবং শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ক্রমশ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।'[১৭]

বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ থেকে স্বাধিকার আন্দোলন: ১৮৫৪ সালে সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় বাংলা প্রেসিডেন্সি এবং এর শাসনভার ন্যস্ত হয় একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উপর। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রশাসন একজন গভর্নরের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা অসম্ভব ছিল। প্রশাসনিক সুবিধার্থে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে আসামকে বিচ্ছিন্ন করা হয় (১৮৭৪ খ্রি.)। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল বাংলা ও বাঙালি জাতি। এর প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। কংগ্রেসের ভেতর গড়ে ওঠা উগ্রজাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য ছিল বিপজ্জনক। তৎকালীন গভর্নর লর্ড কার্জন অনুভব করেন– বাংলা তথা বাঙালিকে দুর্বল করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন বিভাজন নীতি 'ভাগ করো এবং শাসন করো' (Divide and Rule)। অন্যদিকে পূর্ববাংলা আর্থ-সামাজিক উন্নতি তথা যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা থেকে একেবারে পিছিয়ে ছিল। লর্ড কার্জনের প্রত্যাশা ছিল– বাংলাকে বিভাজন করে পশ্চাদপদ পূর্ববাংলায় প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ

মুসলমানদের আনুগত্য আদায়। এতে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে। লর্ড কার্জন বাংলার পূর্বাঞ্চল ও আসাম নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আসাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ নিয়ে, এর সঙ্গে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদহ সংযুক্ত করে এবং দার্জিলিং বাদ দিয়ে গঠিত হয় 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশ (১০ জুলাই, ১৯০৫ খ্রি.)। এই প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা এবং বিকল্প রাজধানী চট্টগ্রাম। পশ্চিমবাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে একত্রে পৃথক বাংলা প্রদেশ হিসেবে থেকে যায়।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার জনগণ নিজেদের আশীর্বাদ মনে করে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। এর ফলে তাদের মধ্যে শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গণজাগরণের সূচনা ঘটে। রাজধানী ঢাকা আবার তার পুরনো গৌরব ফিরে পায়। চট্টগ্রামকে ঘিরে এতদঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। কিন্তু কলকাতার হিন্দুসমাজ তাদের স্বার্থ খর্ব হওয়ায় প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিভিন্ন সংগঠন ও কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। নিজে 'রাখীবন্ধন' কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন এবং বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচনা করেন। হিন্দুনেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং সমগ্র বাংলাব্যাপী 'স্বদেশী আন্দোলন' গড়ে তোলেন। জাতীয় কংগ্রেসও এতে সমর্থন দেয় এবং ক্রমে তা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। বাংলার এই আন্দোলন অচিরেই মুসলিম-বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে এবং নতুন প্রদেশ টিকিয়ে রাখার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব আলী চৌধুরী, উদীয়মান নেতা আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নিরলস প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সভায় নতুন প্রদেশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং এর সপক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের আন্দোলন প্রতিরোধে এবং মুসলসানদের সংহতি প্রতিষ্ঠায় নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকায় 'প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ' গঠন করেন (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রি.)। ১৯০৬ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় গঠিত হয় সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন– মুসলিম লীগ। এর মাধ্যমে মুসলমানেরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের কথা সরকারের নিকট ব্যক্ত করার সুযোগ লাভ করে।

লর্ড কার্জন পদত্যাগ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর স্থলে লর্ড মিন্টো নতুন ভাইসরয় হয়ে আসেন। সেসময় পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন ফুলার। তিনি স্বদেশী আন্দোলনকারীদের প্রতি দমননীতি গ্রহণ করলে তারা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং এই আন্দোলন অবশেষে রূপ নেয় বিপ্লবী তথা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে। বিপ্লবীরা দেশময় অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে।

হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান উগ্র মনোভাব ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অবনতিশীল পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আবেদনের প্রেক্ষিতে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংল্যান্ডে বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ প্রেরণ করেন। অন্যদিকে স্বদেশীয় বণিকদের চাপে ও নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী

নীতির স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববাংলার জনগণের নিকট দেয়া প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে ও তাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ অনুমোদন করে। 'অবশেষে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লি দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ও কলকাতা থেকে দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরের ঘোষণা দেন।'[১৮] বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে কংগ্রেস ও হিন্দুসমাজ উল্লসিত হলেও মুসলমান সমাজ মর্মাহত হয়। মুসলমানদের সার্বিক জীবনধারায় যে উন্নতির সূচনা হয়েছিল, তা আবার রুদ্ধ হয়ে যায়। মুসলমানরা হতাশ হয়ে পড়ে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।

একথা সত্য, বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে ভয়াবহ অবনতি ঘটায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পর দূরত্বে চলে যায়। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানদের সরকার-প্রীতিতে ভাটা পড়ে, মোহভঙ্গ হয়। ব্রিটিশ শাসন-শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক সম্প্রীতি, ঐক্য ও সহযোগিতা জরুরি। এই উপলব্ধি থেকেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনেকেই স্বাধিকার আন্দোলনের প্রয়োজনে মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করেন। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে লক্ষ্ণৌতে আহূত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ের বার্ষিক অধিবেশনে সরকারের নিকট পেশ করা হবে এমন একটি যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রস্তাব গৃহীত হয় যা ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ-চুক্তি (Lucknow Pact) নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে কংগ্রেস মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ও মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রতিটি প্রদেশের আইনসভায় আসন সংরক্ষণের দাবি মেনে নেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ভারতবাসী যখন সরকারের নিকট থেকে উদার শাসন-সংস্কার প্রত্যাশা করছিল, সেসময় সরকারের অত্যাচারনীতি জনগণের মধ্যে ভয়ানক ক্ষোভ, হতাশা ও ইংরেজ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। জার্মানির সহযোগিতায় যুবকশ্রেণির একটি পক্ষ স্বাধিকার অর্জনের চেষ্টা করছে– এমন অজুহাতে সরকার দমন-পীড়নমূলক রাও-লাট আইন বলবৎ করে। এর বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী নিরস্ত্র ও অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দেন। কিন্তু এই আন্দোলন একসময় সহিংস হয়ে ওঠে এবং সরকার পক্ষও তা কঠোরভাবে দমনে তৎপর হয়। জেনারেল ডায়ার পাঞ্জাবের অমৃতসরের বেসামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে শাসনভার গ্রহণ করলে প্রতিবাদে দশ হাজার মানুষ জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক উদ্যানে সমবেত হয়। ডায়ারের নির্দেশে সেনাবাহিনী কোনোরূপ পূর্বসতর্ক ছাড়াই নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে প্রায় ৪ শত জনকে হত্যা করে ও সহস্রাধিক মানুষকে আহত করে (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ খ্রি.)। রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতার প্রতিবাদে ব্রিটিশসরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।

বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য আরেকটি ঘটনা হলো– বেঙ্গল প্যাক্ট। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও অন্যান্য নেতার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে সঙ্গে নিয়ে ১৯২২ সালে 'স্বরাজ্য পার্টি' গঠন করেন এবং কংগ্রেস সভাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ বহু যুবনেতা স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন। পরের বছর বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে এই দল বিপুলভাবে জয়ী হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ উপলব্ধি করেছিলেন– বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সহযোগিতা ব্যতীত

ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তিনি মুসলমানদের নানাবিধ সমস্যা নিরসনে এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে উক্ত চুক্তিটি সম্পাদন করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর (১৯২৫ খ্রি.) বেঙ্গল প্যাক্ট ও স্বরাজ্য পার্টি অকার্যকর হতে থাকে। ভারতীয় রাজনীতি ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতামুখী হয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। ১৯২৮ সালে নেহেরু রিপোর্টে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিরোধিতা করা হয়। মুহম্মদ আলী জিন্নাহসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দ নেহেরু রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯২৯ সালে জিন্নাহ সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনে ঐতিহাসিক 'চৌদ্দ-দফা' দাবি উত্থাপন করেন। এর পর থেকে ভারতের হিন্দু ও মুসলিম রাজনীতি স্বতন্ত্র ধারায় বহমান হয়।

ভারত বিভাগ পর্যন্ত বাংলার রাজনীতি ও পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশ: ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইন' প্রণয়ন করে। সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ভোটাধিকার সম্প্রসারণ প্রভৃতি এই আইনের উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল। এর প্রেক্ষিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন ও সাধারণ জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগ দেখতে পান। ১৯৩৭ সালে ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা হলে বাংলার মুসলিম সমাজে বিপুল সাড়া জাগে। এসময় স্যার আব্দুর রহিম প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' (১৯২০ খ্রি.) একমাত্র সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল এবং এর নেতা ছিলেন এ কে ফজলুল হক। সংগঠনটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 'চৌদ্দ দফা' নামে একটি মেনিফেস্টো প্রকাশ করে। নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি পরিবর্তন করে সংগঠনটির নতুন নামকরণ হয় 'কৃষক-প্রজা পার্টি' (১৯৩৬ খ্রি.)। পাশাপাশি বাংলার অভিজাত শ্রেণির মুসলিম নেতৃবৃন্দ কলকাতার এক সভায় মিলিত হয়ে 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' নামক আরেকটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। খাজা নাজিমউদ্দীন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতা এই দলে যোগদান করেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বিলাত থেকে ফিরে এসে কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়া মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হন। তিনি আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্যের লক্ষ্যে বাংলায় কৃষক-প্রজা পার্টি, ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি, এম এ এইচ ইস্পাহানির নিউ মজলিস পার্টিকে একীভূত করে তিন দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মুসলিম লীগের একটি নির্বাচনী জোট গঠন করেন। কিন্তু নির্বাচনী সংস্থার প্রথম বৈঠকে কৃষক-প্রজা পার্টি ঘোষিত চৌদ্দ দফার কিছু বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্যরা ঐকমত্য পোষণ না করায় এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন এই দল মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে আসে এবং এককভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো একজন বলিষ্ঠ নেতার নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ দ্রুত একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

নির্বাচনে মুসলিম লীগ ভালো ফলাফল করে। তবে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় মন্ত্রিপরিষদ গঠন নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। গভর্নর প্রথমে কংগ্রেসনেতা শরৎ বসুকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। শরৎ বসু কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ফজলুল হককে সমর্থনের আশ্বাস দেন। বিনিময়ে তিনি বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন, যেগুলো গ্রহণ করা ফজলুল হকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশেষে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা হয়। গঠিত হয় ফজলুল হকের

নেতৃত্বাধীন অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। ফজলুল হকের তিন বছরের শাসনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে এক নীরব বিপ্লব ঘটে।

কংগ্রেস মাদ্রাজ, বোম্বে ও যুক্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোস করে নির্বাচন করে। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণকালে নির্বাচনমৈত্রী অনুযায়ী মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে। কংগ্রেসের এই দ্বিমুখী নীতিকে জিন্নাহ বিশ্বাসভঙ্গ মনে করেন, কংগ্রেসের ওপর থেকে আস্থা হারান। ফলশ্রুতিতে ১৯৩৯ সালে 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' (Two-Nation Theory) ঘোষণা করেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের ১৩ মার্চ মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হয়। এতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানানো হয়। এ কে ফজলুল হক এই প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন। তিনি লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে পৃথক দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান। স্মর্তব্য, 'তিনি কখনো জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও দ্বি-জাতি তত্ত্বের উল্লেখ নেই। এই প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দটিরও উল্লেখ নেই, যদিও তা দ্রুত পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।'[১৯] হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেস এর তীব্র সমালোচনা করে একে রাজনৈতিক দিক থেকে 'অসম্ভব' এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে 'পাগলামি' বলে মন্তব্য করেন।

পূর্বরণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর বিপর্যয় ঘটলে এবং জাপানি বাহিনী ব্রহ্মদেশ দখল করলে মিত্রপক্ষে ভারতীয়দের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। সেই লক্ষ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনসটন চার্চিল কেবিনেট সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে একটি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবসহ ভারতে পাঠান (১৯৪২ খ্রি.)। ক্রিপস প্রস্তাবে বলা হয়– যুদ্ধ শেষে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে। কিন্তু ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে চার্চিলের রক্ষণশীল দলের পরাজয় হলে ক্ষমতায় আসে শ্রমিক দল। যারা ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে বিশ্বাসী ছিল। নতুন প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ইতোমধ্যে ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ৩০ টি আসনের সবগুলোতেই জয়লাভ করে। বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনেও দলটি ১১৯ টি আসনের মধ্যে ১১৩ টি আসনে বিজয়ী হয়। সোহরাওয়ার্দী পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন (এপ্রিল, ১৯৪৬ খ্রি.)। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে প্রত্যাশিত সাফল্যের পর মুসলিম লীগ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি সুদৃঢ় হয়।

রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ১৯৪৬ সালে 'কেবিনেট মিশন' নামে দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ভারতে আসে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবির প্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে দিল্লিতে একটি কনভেনশনে মিলিত হন। লাহোর প্রস্তাবে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র (Independent States) গঠনের উল্লেখ থাকলেও ভারতের উত্তর-

পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে 'পাকিস্তান' নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে আবুল হাশিমের প্রশ্নের জবাবে জিন্নাহ States শব্দের s টাইপের ভুলে হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। সোহরাওয়ার্দী কেবিনেট মিশনকে পাকিস্তান গঠনের দাবি মেনে নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের আহ্বান জানান। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর কেবিনেট মিশন কিছু শর্তারোপ করে তাদের প্রস্তাবিত শাসন-পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। শাসন-পরিকল্পনায় মুসলিম লীগ স্বাধীন পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে এবং তা গ্রহণে সম্মত হয়।

কিন্তু মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসনেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহ্বান জানান। নেহেরু ১৯৪৬ সালের ২৪ জুন সরকার গঠন করেন এবং শর্তসাপেক্ষে মাত্র ৫ জন মুসলিম লীগ সদস্যকে সরকারে নিতে রাজি হন। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এমন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন এবং উক্ত সরকারে যোগদানে অস্বীকৃতি জানান। ইতঃপূর্বে প্রদত্ত কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণের সম্মতি প্রত্যাহার করেন। পাকিস্তান অর্জনে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের জন্য একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় (জুলাই, ১৯৪৬ খ্রি.)। সোহরাওয়ার্দী ব্রিটিশ সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন– "কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এবং পাল্টা সরকার গঠন করবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনো রাজস্ব প্রদান করবে না এবং বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে।"[২০] ১৬ অগাস্ট সমগ্র ভারতে মুসলমানরা হরতাল পালন ও সভা-সমাবেশ করে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালন করে।

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পারস্পরিক অসহযোগিতা এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতিশীল অবস্থার মোকাবেলা করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যর্থ হয়। এমন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি পার্লামেন্টের এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ভারতের শেষ বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনা করেন। জিন্নাহসহ মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতা পাকিস্তান দাবির বিষয়ে অটল মনোভাব প্রদর্শন করলে কংগ্রেস মুসলিম লীগের দাবি মেনে নেয়। তবে কংগ্রেস বাংলা ও পাঞ্জাব সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করার নতুন দাবি উত্থাপন করে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ২৭ এপ্রিল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। বাংলার অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেসনেতা শরৎ বসু, কিরণ শঙ্কর রায়সহ আরও অনেক নেতা এ প্রস্তাবে সম্মতি জানান। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে একটি সমৃদ্ধিশালী প্রগতিশীল অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করতে পারতো। কিন্তু কংগ্রেসের অবাঙালি বুর্জোয়া নেতাদের বিরোধিতা ও জিন্নাহর এক-পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়ায় বসু-সোহরাওয়ার্দীর অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়। উল্লেখ্য, 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনানুযায়ী বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের সংসদ-সদস্যগণ ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পৃথক পৃথক বৈঠকে বসেন। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিবর্গ ১০৬ : ৩৫ ভোটে অখণ্ড

বাংলার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অপরপক্ষে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিবর্গ বর্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে মিলিত হয়ে ৫৮ : ২১ ভোটে বাংলার বিভক্তির পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। ফলে বাংলা পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা এই দুই অংশে বিভক্ত হয়।'[২১] সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার প্রতিনিধিবর্গ পাকিস্তানের পক্ষে এবং পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধিবর্গ ভারতের পক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে খণ্ডিত পূর্ববাংলাসহ ১২০০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুটি অঞ্চল নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট আত্মপ্রকাশ করে পাকিস্তান নামক বিচ্ছিন্নদেহী স্বাধীন রাষ্ট্রটি। পাকিস্তানের উভয় অংশের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার, ঐতিহ্য, অর্থনীতি পৃথক হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র ধর্মীয় সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একরাষ্ট্রে পরিণত করা যে শুভকর হয়নি, পরবর্তী সময়ের ইতিহাসে সেটিই প্রমাণিত হয়।

পাকিস্তানি শাসন ও স্বাধীন বাংলাদেশ

বাঙালি ব্রিটিশ কবল থেকে মুক্ত হলেও পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর নাগপাশে আবার নতুন করে বন্দি হয়। শুরুতেই তাদের সন্দেহ, অবহেলা ও বঞ্চনা লক্ষ্য করে পূর্বপাকিস্তানের মানুষ হতাশ হয়। এই দেশের মানুষকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে কোণঠাসা করে রাখার চক্রান্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুহম্মদ আলী জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল পদ গ্রহণ করেন এবং লিয়াকত আলী খানকে প্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই দুটি পদের একটিও বাঙালিকে দেওয়া হয়নি। রাজধানীসহ দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দফতরও স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী করা হয় প্রাদেশিক নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দীর নিকট পরাজিত, সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানো, উর্দুভাষী খাজা নাজিমউদ্দীনকে।

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। তাদের মতে– হিন্দুঘেঁষা মুসলমানদের ভাষা-সংস্কৃতি ইসলামিক নয়। বাঙালিদের খাঁটি মুসলমান (!) বানাতে হলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করত হিন্দুসংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করতে হবে। এ জন্য বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণ, সংস্কৃত ও আদি বাংলা শব্দমালা বাতিল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে ফেলা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ বাংলাভাষী পূর্ববাংলার মানুষের মনে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দু-ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও অন্তর্ভুক্তির দাবি তোলেন কংগ্রেস দলীয় সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু মুসলিম লীগ সদস্যগণসহ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এর বিরোধিতা করেন। এতে ঢাকার ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় এবং 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ১১ মার্চ তারিখে হরতাল কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের তীব্রতা উপলব্ধি করে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আট দফা আপোস-চুক্তি করেন। যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপনের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা: পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক মনোভাব ও সরকারি নীতির প্রতিবাদে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করার লক্ষ্যে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৯ সালে ঢাকায় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেন। তৎকালীন বিশিষ্ট যুবনেতা শেখ মুজিবুর রহমান দলের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে ভাসানীর উদ্যোগে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠনটির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' (১৯৫৫) করা হয়। মুসলিম লীগের দুঃশাসন ও জনবিরোধী কার্যকলাপে অতিষ্ঠ এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি ক্রমশ এই দলটির প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

ভাষা আন্দোলন: পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত জনসভায় বলেন– "...let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Any one who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan."[২২] এতে বিক্ষুব্ধ হয় ওঠে ছাত্র-জনতা। তিন দিন পর কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে ছাত্ররা No, No বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। জিন্নাহ-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন খাজা নাজিমউদ্দীন (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ খ্রি.) এবং তিনি নূরুল আমিনকে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিমউদ্দীন সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। নাজিমউদ্দীন ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জিন্নাহ-এর অনুকরণে পুনরায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। আবার প্রদেশব্যাপী আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয়। গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ২১ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐদিন হরতাল, বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। নূরুল আমিন ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি বানচালের উদ্দেশ্যে আগের দিন বিকেল থেকেই ঢাকায় মিছিল ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মিছিল বের করে মেডিকেল কলেজের সম্মুখে সমবেত হয় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। দুপুর পর সমবেত ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস লাঠিচার্জ করে, টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে এবং এক পর্যায়ে গুলিবর্ষণ করে। এতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ অনেকেই নিহত হন এবং বহু সংখ্যক আহত হয়। ভাষা-আন্দোলনকে সমর্থন করায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিম, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন-সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠে। অবশেষে এপ্রিল মাসে নূরুল আমিন বাংলাকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব মেনে নেন। ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে।

প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট এবং পাকিস্তানের সংবিধান তৈরি: ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের শাসন অব্যাহত থাকে। এসময় এখানে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি না

হওয়ায় এবং শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারিতায় বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার লক্ষ্যে এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলো 'যুক্তফ্রন্ট' নামে ঐক্যজোট গঠন করে (৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ খ্রি.)। নৌকা প্রতীক নিয়ে যুক্তফ্রন্ট একুশ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং ৩০৯ টির মধ্যে ৩০০ টি আসনেই বিজয়ী হয়। এই বিজয় ছিল মুসলিম লীগের সাত বছরের কুশাসনে এদেশের জনগণের পুঞ্জীভূত বেদনা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। যুক্তফ্রন্টের এই সাফল্যে পাকিস্তানি নেতারা ক্ষুব্ধ হন। ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হলে এর পতনে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে আইন-শৃঙ্খলা অবনতির অজুহাতে দু'মাস অতিক্রান্ত না হতেই গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে গভর্নরের শাসন জারি করেন। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর হয়ে এসে ফজলুল হককে স্বগৃহে অন্তরীণ করেন। আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রায় তিন হাজার নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠান।

গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর সার্বভৌম গণপরিষদ বাতিল করে সারাদেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। এর বিরুদ্ধে গণপরিষদের সভাপতি মৌলভী তমিজউদ্দীন খান মামলা দায়ের করলে ফেডারেল কোর্ট গভর্নর জেনারেলকে নতুন গণপরিষদ গঠন করে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য রুলিং প্রদান করেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সালেন জুন মাসে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট মিলিতভাবে পাঞ্জাবের চৌধুরী মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে ১১ অগাস্ট নতুন কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী হন চৌধুরী মুহম্মদ আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক ও বিরোধী দলীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী। 'এই কোয়ালিশন সরকার ১৯৫৬ সনে সংখ্যাসাম্য নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনা করে। এই সংবিধানে পূর্ববাংলার নাম পূর্বপাকিস্তান হয় এবং সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় কেন্দ্রে। স্বায়ত্তশাসন ও যুক্ত নির্বাচনের দাবী অগ্রাহ্য করা হয়। পাকিস্তান 'ইসলামিক রিপাবলিক' নামে পরিচিত হয়।'[২৩] গোলাম মোহাম্মদ পদত্যাগ করায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ইস্কান্দার মির্জা। তিনি সামরিক বাহিনীর সমর্থনে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। ইস্কান্দার মির্জা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। ফলে গণতন্ত্রকামী চৌধুরী মুহম্মদ আলীর সঙ্গে অচিরেই বিরোধ বাধে এবং তাঁর হস্তক্ষেপে মুসলিম লীগ-যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খ্রি.)।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা, ন্যাপ গঠন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসন ও ক্ষমতা দখল: এ কে ফজলুল হক ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেন। ৫ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আতাউর রহমান খান কয়েকটি দলের সমন্বয়ে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন (৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খ্রি.)। এর ঠিক ৫ দিনের মাথায় কেন্দ্রে মন্ত্রিসভার রদবদল হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। এসময়

বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশে সোহরাওয়ার্দীর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা তৈরি হয়। এতে ভীত হয়ে পড়েন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা। প্রেসিডেন্টের ষড়যন্ত্রে অবশেষে বাধ্য হয়ে সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করেন (১৬ অক্টোবর, ১৯৫৭ খ্রি.)। ইতঃপূর্বে পূর্বপাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পাক-মার্কিন চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি ইত্যাদি সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ– এই দুইটি বিষয়ে আপোসপ্রবণ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে অনমনীয় মওলানা ভাসানীর মতবিরোধ চরমে ওঠে। এরই প্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' ন্যাপ গঠন করেন (জুলাই, ১৯৫৭ খ্রি.)। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনের পর কেন্দ্রে ও পূর্বপাকিস্তানে ঘনঘন ক্ষমতার পালাবদল দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে এবং রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে। পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে স্পিকার মনোনয়নকে কেন্দ্র করে পরিষদ কক্ষে সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী নিহত হন। দেশে চলমান রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে ইস্কান্দার মির্জা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন (৮ অক্টোবর, ১৯৫৮ খ্রি.)। সামরিক আইন জারির সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয়-প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা এবং আইন পরিষদ বাতিল করা হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ করা হয়। প্রাক্তন পুলিসপ্রধান জাকির হোসেন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ নেতা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সামরিক আইন বলবতের ঠিক ঊনিশ দিনের মাথায় অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান রাজনৈতিক অচলাবস্থার দায়ে ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করে নিজেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে সেনাবাহিনী প্রধান ও সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবেও বহাল থাকবেন বলে ঘোষণা দেন।

আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ও নির্বাচন, আন্দোলনের সূচনা: সুচতুর রাজনীতিক আইয়ুব খান নিজের ক্ষমতা দখলকে 'অক্টোবর বিপ্লব' নামে অভিহিত করেন এবং এর যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য শাসনব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনেন। জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য তিনি রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। '১৯৫৯ সালের ৭ অগাস্ট থেকে পোডো (PODO= Public Office Disqualification Order) ও এবডো (EBDO= Elective Bodies Disqualification Order) নামে দুটি অধ্যাদেশ জারি করে আইয়ুব তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আব্দুল গাফফার খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানাসহ পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের বহু অভিজ্ঞ ও জনপ্রিয় নেতা উক্ত দুটি আইনের স্বীকার হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ানোর অযোগ্য ঘোষিত হন।'[২৪] ২৭ অক্টোবর তাঁর বিপ্লবের (!) প্রথম বার্ষিকীতে স্ব-উদ্ভাবিত চার স্তরবিশিষ্ট মৌলিক গণতন্ত্রের আদেশ (Basic Democracies Order) জারি করেন। পাশ্চাত্যের সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে তাঁর পরিকল্পিত এমন গণতন্ত্রই বেশি ফলপ্রসূ হবে বলে ব্যাখ্যা দেন। 'ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যরাই 'মৌলিক গণতন্ত্রী' বা বিডি (Basic Democrats) নামে পরিচিত।'[২৫]

প্রথমে পাকিস্তানের উভয় অংশে চল্লিশ চল্লিশ আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হবেন। এরা পুনরায় প্রেসিডেন্টসহ কেন্দ্রে ও প্রদেশে পারিষদ নির্বাচন করবেন। এভাবে সার্বজনীন ভোটধিকার বিলুপ্ত করে পরোক্ষ নির্বাচন চালু করা হয়। এমন অভিনব পদ্ধতির মাধ্যমে ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হন।

আইয়ুব খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, অসৎ ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্রেণির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে তাঁর গঠিত বিভিন্ন কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। তবে পূর্বপাকিস্তানের মানুষ দ্রুতই আইয়ুব খানের দুরভিসন্ধি, সংকীর্ণতা, পক্ষপাতমূলক আচরণ ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৯৬২ সালের ২৪ জানুয়ারি আতাউর রহমানের বাসভবনে শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিষয়ে এক বৈঠক বসে। দেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত– এমন অভিযোগে সোহরাওয়ার্দী করাচিতে গ্রেফতার হন। এর প্রতিবাদে ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন শুরু হয় এবং ক্রমেই তা গণআন্দোলনে জোরদার হতে থাকে। আইয়ুব খান জননিরাপত্তা অধ্যাদেশ বলে শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জল হেসেন মানিক মিয়া, আবুল মনসুর আহমদ, তাজউদ্দীনসহ বহু নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে গণআন্দোলন দমনের চেষ্টা করেন।

'৬২-র শাসনতন্ত্র ঘোষণা, জাতীয় পরিষদের নির্বাচন, সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও আওয়ামী লীগ পুনর্গঠন: গণআন্দোলনের তীব্রতা অনুভব করে আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে তাঁর পরিকল্পিত শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের সকল ক্ষমতা খর্ব করে প্রেসিডেন্টের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। আমলারা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এই শাসনতন্ত্র বাতিল, রাজবন্দিদের মুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে পূর্বপাকিস্তানে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। চলমান আন্দোলনের মধ্যেই আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করেন (২৮ এপ্রিল, ১৯৬২ খ্রি.)। নির্বাচনের একদিন আগে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মৃত্যুবরণ করেন। আওয়ামী লীগসহ পূর্বপাকিস্তানের প্রগতিশীল দলগুলো নির্বাচন বর্জন করায় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগপন্থীরা সহজেই নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়। কিছুদিন পর শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে করাচির কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। স্বৈরশাসকের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' গঠন করেন। এসময় এদেশেরই সন্তান অথচ প্রচণ্ড আইয়ুবভক্ত আব্দুল মোনায়েম খানকে পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এরই মধ্যে বৃদ্ধ বয়সে কারাবাস, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং মানসিক অশান্তি জনিত সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৈরুতে প্রাণত্যাগ করেন। আট মাসের ব্যবধানে দুই জন প্রথম সারির নেতার মৃত্যুতে এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়। অবশ্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনর্গঠিত হয়।

১৯৬৫ সালের নির্বাচন, পাক-ভারত যুদ্ধ, ৬ দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও আইয়ুব খানের বিদায়: প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে

নির্বাচনের ঘোষণা দেন। প্রেসিডেন্ট পদে একদিকে স্বয়ং আইয়ুব খান প্রার্থী হন, অন্যদিকে পাঁচটি দল জোটবদ্ধ হয়ে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নি ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দেয়। ১৯৬৫ সালের মার্চ ও মে মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে আইয়ুব খানেরই জয় হয়। কারণ, সরকারি প্রশাসনযন্ত্র তাঁর পক্ষে কাজ করে, মৌলিক গণতন্ত্রীরা নিজেদের স্বার্থে তাঁকেই ভোট দিতে বাধ্য হয়। ২৩ মার্চ আইয়ুব খান দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৬৫ সালের অগাস্ট মাসে কাশ্মিরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধ চলাকালে দলমত নির্বিশেষে জনগণ সরকারের পাশে দাঁড়ায়। তবে এসময় পূর্বপাকিস্তানের সুরক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্রের উদাসীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং দেশ পুনর্গঠনের নামে ট্যাক্সের বিরাট বোঝা বাঙালিদের ঘাড়ে চাপানো হয়। এখানকার সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। বেতারে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে শাসকপক্ষ বৈষম্য নীতি গ্রহণ করায় এদেশের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে এবং একই সঙ্গে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে লাহোরে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত সম্মেলনে যোগদান করে পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার দাবি সম্বলিত এক কর্মসূচি পেশ করেন– যা ঐতিহাসিক ৬ দফা নামে পরিচিত। ৬ দফা কর্মসূচি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপাকিস্তানে আন্দোলন-সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠতে থাকে। সরকার ও ডানপন্থী দলগুলো ৬ দফার অপব্যাখ্যা করে আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদী দল হিসেবে চিহ্নিত করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। ২০ মার্চ ঢাকায় 'মুসলিম লীগের কাউন্সিল মিটিংয়ে সভাপতির ভাষণে আইয়ুব খান এই বলে হুমকি দেন যে, যারা ৬ দফা কর্মসূচির কথা বলবে, সেসব গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করা হবে।'[২৬] মোনায়েম খান শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের হয়রান করতে থাকেন। অবশেষে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীসহ শেখ মুজিবকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের বলে গ্রেফতার করা হয় (৮ মে, ১৯৬৬ খ্রি.)। এ ঘটনার প্রতিবাদে প্রদেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয়। আন্দোলন-বিক্ষোভ জোরদার হতে থাকে। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শেখ মুজিবসহ কয়েকজন সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেশের স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়। অভিযুক্তরা আগরতলায় ভারতের সঙ্গে গোপন চুক্তির মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছেন– এই অজুহাতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে আরো ৩৪ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামক মামলা দায়ের করা হয়।

আইয়ুব খানের এই সাজানো মামলায় পূর্বপাকিস্তানের জনগণের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষের আগুন জ্বলে ওঠে। ছাত্ররা শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। পশ্চিমপাকিস্তানেও আইয়ুব সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে পদচ্যুত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ ঢাকায় মিলিত হয়ে ৮ দফা কর্মসূচির

ভিত্তিতে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। বিভিন্ন দলের ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১১ দফার ভিত্তিতে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে এবং ১৮ জানুয়ারি থেকে আন্দোলন শুরু করে। ২০ জানুয়ারি ছাত্রদের একটি বিক্ষোভ মিছিলে পুলিস গুলিবর্ষণ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হন। ক্রমশ এই আন্দোলন তীব্রতর হয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারি বন্দি অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডক্টর শামসুজ্জোহা পুলিসের গুলিতে নিহত হন। এর প্রতিবাদে সারাদেশ বিক্ষোভ-আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। আন্দোলনের প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করে আইয়ুব খান আগামি নির্বাচনে না-দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। গণদাবির মুখে গভর্নর মোনায়েম খানকে বরখাস্ত করে ডক্টর এম এন হুদাকে নিয়োগ দেন এবং ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেন। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য রাজবন্দিদেরও মুক্তি দেন। পরদিন রেসকোর্স ময়দানে তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত এক জনসভায় কারামুক্ত শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে আইয়ুব খানের আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করে উল্লিখিত দফাসমূহের ভিত্তিতে আলোচনা চালাবেন বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারির গোলটেবিল বৈঠকে স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে আলোচনা ব্যর্থ হলে দেশের আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটতে থাকে। অন্য দিকে পশ্চিম-পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে চারটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবিতে গণ-আন্দোলন শুরু হয়। 'এমতাবস্থায় আইয়ুবের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বৈরাচারী আইয়ুব তার ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেয়ার চেয়ে সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণ করাকে শ্রেয় মনে করলেন।'[২৭] সে অনুযায়ী তিনি ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় নেন।

ইয়াহিয়া খানের শাসন, '৭০-এর নির্বাচন, ক্ষমতা হস্তান্তরে ষড়যন্ত্র, ৭ মার্চের জনসভা, অসহযোগ কর্মসূচি: ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হাতে পেয়েই স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেন এবং ২৫ মার্চ রাতেই দ্বিতীয় বারের মতো দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র এবং জাতীয় পরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেন। জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাবার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার জন্য 'আইনগত কাঠামো আদেশ' (Legal Frame Order) LFO জারি করেন। বঙ্গবন্ধুর দাবির প্রেক্ষিতে পূর্বেকার দুই প্রদেশের সমানসংখ্যক মৌলিক গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব বাতিল করেন এবং LFO অনুযায়ী 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতির আলোকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশে প্রতিনিধি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

LFO-এর মূলনীতির সঙ্গে ৬ দফা সাংঘর্ষিক হলেও নিজেদের জনপ্রিয়তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ায় আওয়ামী লীগ নিজস্ব ৬ দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতে

এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রেসিডেন্ট ও তাঁর উপদেষ্টারা ধরেই নিয়েছিলেন– আওয়ামী লীগ কখনোই পূর্ব-পাকিস্তানে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করবে না, অন্যান্য দলও কিছু কিছু আসন পাবে। সুতরাং আওয়ামী লীগের ৬ দফা কার্যকরী হবে না এবং পশ্চিম-পাকিস্তানি দলগুলোর মর্জিমাফিক শক্তিশালী কেন্দ্রীয়শাসন বহাল হবে। নভেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও ১২ নভেম্বর পূর্বপাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ টর্নেডো আঘাত হানায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে যথাক্রমে ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর করা হয়। নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তানের জনগণ ৬ দফার পক্ষে রায় দেয়। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টিতে বিজয়ী হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদের ১৪৪ টি আসনের মধ্যে ৮৮ টি আসন দখল করতে সমর্থ হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি দাবি করেন, অন্যদিকে শেখ মুজিব ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে অটল থাকেন। শুরু হয় রাজনৈতিক সংকট।

জাতীয় পরিষদের আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিবেচনায় শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়। কিন্তু ভুট্টোর যোগসাজশ হওয়ায় সামরিকচক্র কোনোভাবেই সেটি করতে চায় না। বেকায়দায় পড়েন ইয়াহিয়া খান। কিছুটা সদিচ্ছা থাকলেও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে তিনি গভীর ষড়যন্ত্রকারী স্বার্থান্বেষী উক্ত মহলের ক্রীড়নক হয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোসহ ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কিন্তু জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণে টালবাহানা শুরু করেন। অবশেষে ভুট্টোর পরামর্শক্রমে ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় অধিবেশনের দিন ধার্য করেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে পয়লা মার্চ তিনি ঘোষণা করেন– জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এমন সিদ্ধান্তে পূর্বপাকিস্তানে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিব চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার ডাক দেন। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে এক বিশাল ছাত্র-সমাবেশ হয়। সেখানেই সর্বপ্রথম 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ এবং লাল-সবুজের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ ইয়াহিয়া খান ১০ মার্চ এক বৈঠক আয়োজনের কথা ঘোষণা করলে শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা ২ মার্চ হরতাল চলাকালে বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনী শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে বহু মানুষকে হতাহত করে। তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেন– "বাঙালিরা যখন সেনাবাহিনীর গুলিতে শহীদ হচ্ছে, তখন এ আমন্ত্রণ এক নির্মম তামাশা। বন্দুকের নল উঁচিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।"[২৮] তিনি সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান। ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন– ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। এইদিন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ৭ মার্চের জনসভা বানচালের উদ্দেশ্যে ঐদিন সরকার শহরময় কারফিউ বলবৎ করে। কিন্তু হাজার হাজার উজ্জীবিত জনতা কারফিউ ভঙ্গ করে জনসভায় যোগ দিতে থাকে। রেসকোর্স

ময়দান পরিণত হয় এক বিশাল জনসমুদ্রে। শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে জনগণকে অসহযোগ আন্দোলনের এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান।

৮ মার্চ হতে পূর্বপাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ পরিচালনায় অস্বীকৃতি জানান। বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকে। মওলানা ভাসানী পাকিস্তানি শাসকচক্রকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে আহ্বান জানান। জাতীয় পরিষদের অন্তত ২০০ জন সদস্য শেখ মুজিবকে সমর্থন করে তাঁর সরকার গঠনের পক্ষে মত দেন। ১৫ মার্চ শেখ মুজিব বাংলাদেশে অসামরিক প্রশাসন চালু করার উদ্দেশ্যে ৩৫ টি বিধি জারি করেন। অবস্থা বেগতিক উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া খান ঐদিন আকস্মিকভাবে ঢাকায় আসেন। ১০ দিন ধরে আলোচনার নামে চলে প্রহসন ও সময়ক্ষেপণ। আসলে এই সময় সামরিক বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সকল প্রস্তুতি গ্রহণ শেষ হলে ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা না করেই দলবলসহ রাতের অন্ধকারে ঢাকা ত্যাগ করেন। নির্দেশ দিয়ে যান বাঙালি নিধনের।

২৫ মার্চের গণহত্যা, মুক্তিবাহিনী গঠন ও স্বাধীনতা ঘোষণা, মুজিবনগর সরকার, যৌথবাহিনীর যুদ্ধ, চূড়ান্ত বিজয়: পাক-হানাদার বাহিনী কর্তৃক শুরু হয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নির্মম ও নিকৃষ্টতম গণহত্যা অভিযান– অপারেশন সার্চলাইট। শেখ মুজিবকে বন্দি করে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়। ২৫ মার্চ মধ্যরাত্রি থেকে হানাদার বাহিনী ট্যাংক, মেশিনগান, মর্টার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালির উপর। তাদের লক্ষ্যস্থল ছিল জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, পিলখানাস্থ তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) ব্যারাক ও রাজারবাগ পুলিস লাইন্স। ২৭ মার্চ পর্যন্ত মাত্র দুই দিনে উক্ত স্থানগুলোসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে হানাদাররা লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করে। মাস দুয়েকের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে তারা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও নারী-নির্যাতন চালাতে থাকে। তাদের সহযোগিতা করে এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী পক্ষ– রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধেও সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিস, আনসার, ছাত্র, কৃষক-মজুরসহ হাজার হাজার সাধারণ মানুষ মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। পরবর্তী নয় মাস মুক্তিবাহিনী যুক্ত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম– মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কর্নেল এম এ জি ওসমানী মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নেন। তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডারের ওপর দায়িত্ব দেন।

২৫ মার্চ রাতে পাক-হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণার লিখিত বাণী চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ২৬ মার্চ দুপুর অড়াইটায় কালুরঘাট ট্রান্সমিশন সেন্টার থেকে সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি এম এ হান্নান এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন,"আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নির্দেশে ও তাঁর নামে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আপনারা যারা এ গোপন রেডিও হতে আমার এই

ঘোষণা শুনছেন তারা অন্যদের নিকট এই বাণী প্রচার করবেন। আর যার নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করুন এবং দেশকে মুক্ত করুন।"[২৯]

স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার পর বাঙালিরা উজ্জীবিত হয়। পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রাম জোরদার করে। ভারতে আশ্রয় নেয়া জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ ১০ এপ্রিল আগরতলায় বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানে (বর্তমান মুজিবনগর) এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে নতুন সরকার কার্যভার গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করে। সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দীর আহমদ। তাঁরা বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থনের জন্য বিভিন্ন দেশে দূত ও পত্র প্রেরণ করেন।

বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ভারত। ভারতের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। বাংলাদেশের হাজার হাজার যুবক সেগুলোতে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে থাকে। যুদ্ধ চলাকালে প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতের সাধারণ জনগণ ও সরকার মুক্তিবাহিনী ও শরণার্থীদের সর্বতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে। শুধু তাই নয়, ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে সামরিক ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে শেখ মুজিবকে হত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন জঘন্য তৎপরতা থেকে ইয়াহিয়া খানকে নিবৃত্ত করারও উদ্যোগ নেয় দেশটির সরকার। '....জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রভাবশালী চব্বিশ দেশের সরকার প্রধানকে শেখ মুজিবের জীবন রক্ষায় পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের আবেদন জানিয়ে পত্র লেখেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রশাসন অনেকটা সক্রিয় হয়ে ওঠে মুজিবের জীবন রক্ষায়। বলা যায়, মার্কিন চাপের মুখে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বিরত থাকে 'বিচারের রায়' দ্রুত বাস্তবায়ন থেকে।'[৩০] অবশেষে ইয়াহিয়া খান এমন ঘৃণ্য পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের উদ্ভূত সমস্যা নিরসনেও বিশ্বনেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন জানান।

সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সফলভাবে অভিযান চালিয়ে যায়। নভেম্বর মাসের প্রথম থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধ তীব্রতর করে হানাদার-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে থাকে। পাক-বাহিনী মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা শত্রুমুক্ত হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে আর শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করার অপরাধে, অন্যদিকে পাক-বাহিনীর নিশ্চিত পরাজয় জেনে ইয়াহিয়া খান এ যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়ার অভিপ্রায়ে ৩ ডিসেম্বর সরাসরি ভারতে আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেন। ইন্দিরা গান্ধীও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৪ ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে স্থল, নৌ ও আকাশপথে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে হানাদার বাহিনীর ঘাঁটিগুলো গুঁড়িয়ে দিতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে পাক-কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী আরো রসদ সরবরাহের

জন্য ইসলামাবাদে আবেদন পাঠান। কিন্তু তাতে কোনো সাড়া মেলে না। অন্যদিকে পাক-বাহিনীর সহায়তায় আগত মার্কিনি সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর থেকে ফিরে যায়। ১৪ ডিসেম্বর নিয়াজী সব আশা ছেড়ে দেন এবং আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন। এই দিন হানাদার বাহিনীর দোসর আলবদর ও আলশামস সদস্যরা দেশকে মেধাশূন্য করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, ডাক্তারসহ অন্যান্য বহু বুদ্ধিজীবীকে রায়েরবাজারে ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ১৬ ডিসেম্বর সকাল দশ টায় পাকিস্তানি ১৪ ডিভিশন কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ মিরপুরে ভারতীয় জেনারেল নাগরার নিকট আত্মসমর্পন করেন। যৌথবাহিনী ঢাকা দখল করে। বিকেল সাড়ে চারটায় জেনারেল নিয়াজী ৯৩ হাজার সহযোগী সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রসহ রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ বাঙালির সামনে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জিওসি-ইন-চিপ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। '...আত্মসমর্পণের নিয়মানুযায়ী জেনারেল নিয়াজী তাঁর পিস্তলটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে হস্তান্তর করেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার, 'এস' ফোর্সের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সফিউল্লাহ, ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর এ টি এম হায়দার, কাদের সিদ্দিকী এবং অন্য নেতারা।'[৩১] এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানিদের ২৩ বছরের শাসন-শোষণ ও বঞ্চনা-বৈরীতার অবসান ঘটে। ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিশ্বমানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'।

তথ্যসূচি:

---

১ ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ বি এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম: *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, দশম সংস্করণ, মার্চ ২০০৩, পৃ. ২৪

২ সম্পাদনা পরিষদ: *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী বিভাগ: ইতিহাস-ঐতিহ্য), এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৭

৩ তদেব, পৃ. ৮

৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার: *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২১

৫ তদেব, পৃ. ২৬

৬ ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ বি এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম: *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৭ ড. আবু নোমান: *প্রাচীন বংলার ইতিহাস*, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৪১

৮ কে এম রাইছউদ্দিন খান: *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ১২৪

৯ তদেব, পৃ. ১৭৭

১০ তদেব, পৃ. ৬৩৩

১১ মো. রেজাউল ইসলাম: *বাংলাদেশ এবং বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, দুরন্ত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৯৭

১২ কালাপাহাড় হচ্ছেন রাজু নামের একজন হিন্দু যুবক। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং কালাপাহাড় নামে

পরিচিত হন। কালো বর্ণ, বিশালদেহী এবং অত্যন্ত বলবান ও সাহসী হওয়ায় এমন নামকরণ।

১৩ ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ বি এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম: *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

১৪ তদেব, পৃ. ৩২২

১৫ তদেব, পৃ. ৩৪৮

১৬ কে এম রাইছউদ্দিন খান: *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৫

১৭ *ঐ*, পৃ. ৫৮০

১৮ ড. মো. মাহবুবর রহমান: *বাংলাদেশের ইতিহাস*: ১৯০৫–১৯৪৭, তাম্রলিপি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৫

১৯ মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান: *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, সুবর্ণ, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ৪৫

২০ আবদুল করিম: *বংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৬৭

২১ মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান: *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

২২ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত: *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*: দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৮৩

২৩ ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ বি এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম: *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯

২৪ ড. মো. শাহজাহান: *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, চয়নিকা, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৯২

২৫ তদেব, পৃ. ১৯৫

২৬ তদেব, পৃ. ২৫৫

২৭ ড. মো. মাহবুবর রহমান: *বাংলাদেশের ইতিহাস*: ১৯৪৭–১৯৭১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০০, পৃ. ২০৬

২৮ ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ বি এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম: *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

২৯ ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন: *বাংলাদেশের ইতিহাস*: ১৯০৫–১৯৭১, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ৪২১

৩০ হরেন্দ্রনাথ বসু, মনিরুজ্জামান মুনীর সম্পাদিত: *বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা*, (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা- মোহাম্মদ সেলিম), জনতা প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৯৭

৩১ তদেব, পৃ. ৩১৮